নির্ব্বিশেষে মিলিয়া থাকেন। সকলের হস্তে পুষ্পমালা, বাদ্যভাণ্ড বাজিতেছে এবং স্ত্রী পুরুষ পরস্পর পরস্পরকে মাল্য অর্পণ পূর্ব্বক সম্পর্ক পাতাইতেছে। সম্বৎসরকাল তাহারা সেই পবিত্র সম্পর্কে অহত হইবে এবং বিপদ সম্পদে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিবে এই তাহাদের লক্ষ্য। এতদ্ব্যতীত তথায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্ম্মসংক্রান্ত অনেক গুলি মেলা হয়। তন্মধ্যে কেন্দুবিল্ব গ্রামে কবি-তিলক জয়দেবের মেলা সর্ব্বপ্রধান। তথায় সম্ভ্রান্ত গৃহের স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে মিলিত হইয়া হইয়া থাকেন। এই মহানগরী কলিকাতা ব্যবসায় ও বাণিজ্যের স্থান, এখানে হিন্দুসমাজ নামমাত্র, এক পরিবারের পার্শ্বস্থ পরিবার পরস্পর পরস্পরের অপরিচিত। ফলত এস্থানে কেহই কাহার নয়। সুতরাং এখানে স্ত্রীজাতির বদ্ধভাব স্বভাবতই হইয়াছে। কিন্তু পল্লীগ্রামের হিন্দুসমাজে গিয়া দেখ, দেখিবে, স্ত্রীলোকের বিলক্ষণ মুক্তভাব। কুলস্ত্রীরা গৃহ হইতে গৃহান্তরে পল্লী হইতে অপর পল্লীতে আবশ্যকমত যাতায়াত করিতেছেন। কোন স্থলে কথক ধর্ম্ম-ঘোষণা করিতেছেন, প্রত্যেক পল্লীর স্ত্রীলোক তথায় উপস্থিত, তাঁহারা ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত স্থানবিশেষে বিশেষ বিধানও দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন স্থলে ব্রাহ্মণসমাজের রীতি এই যে কোন একটী মহাভোজে যে সকল স্ত্রীলোক পাচিকা থাকিবেন পরিবেশনের ভার তাঁহাদেরই হস্তে। এই সূত্রে রাজলক্ষ্মীকেও পাত্র-হস্তে সহস্র সহস্র লোকের মধ্যগামিনী হইতে হয়। পল্লীগ্রামে অতিথি-সপর্য্যা স্ত্রীলোকই করিয়া থাকে। অতিথি যে কোন বর্ণ ও যে কোন জাতি হউক, স্ত্রীলোক তাহার সহিত কথা কয় ও তাহার ভোজনের আয়োজন করিয়া দেয়। দেবর সম্পর্ক মাত্রই তাঁহাদের আলাপ্য। এই প্রসঙ্গে গ্রামের অনেকেরই সহিত তাঁহারা কথোপকথন করিয়াথাকেন। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে হিন্দু-স্ত্রী অস্বাধীন এই প্রবাদটী হিন্দুসমাজের কেবল অপকলঙ্ক মাত্র।

ভ্রাতঃ! তুমি বলিতে পার না যে হিন্দু-স্ত্রী অসূর্য্যম্পশ্যা। তোমার আদর্শ ইউরোপ, তুমি তথাকার রীতি এখানে প্রবর্ত্তিত করিতে চাও। কিন্তু এথাকার মৃত্তিকা ভিন্ন রূপ, ইউরোপের বীজ এখানে অঙ্কুরিত হইতে পারে না। ইউরোপে প্রায় সমস্তই বণিক-চরিত্রের লোক। তজ্জন্যই উহারা অতিশয় পরিব্রজনশীল। তাহাদের অনেকেরই একটা নির্দ্দিষ্ট বাস্তুভূমি নাই। আজ এখানে, কাল সেখানে, পরশ্ব অন্য স্থানে, তাহাদিগকে অধিকাংশ কাল জাহাজে ও হোটেলে কালক্ষেপ করিতে হয়। যে জাতির এইরূপ অস্থায়ী ভাব তাদের স্ত্রীলোককে কাজেই সাধারণের সহিত মিসিতে হয়। এই প্রসঙ্গে ইউরোপীয় স্ত্রীলোক অত্যন্ত স্বাধীন হইয়াছে। ফলত অবস্থা যতদূর স্বাধীনতা দিয়াছে স্ত্রীলোকেরা আবার তাহা বর্দ্ধিত করিয়া লইয়াছে। কিন্তু আমরা জানি অনেক সুশিক্ষিত বিচক্ষণ ইউরোপীয়ও এক্ষণে স্ত্রীজাতির এই আত্যন্তিক স্বাধীনতায় বিরক্ত। তাঁহারা এই বিষয়ে হিন্দুরীতি অনুমোদন করেন। কিন্তু এদেশীয়েরা বণিক-চরিত্রের লোক নয়। তাহাদের প্রত্যেকেরই পৈতৃক বাস্তুভূমি আছে। সাংসার একান্নবর্ত্তী, এ অবস্থায় ইউরোপের আদর্শের অনুরূপ স্ত্রীস্বাধীনতা মূলেই এখানে আসিতে পারে না। তার কাব্য অলঙ্কার ত দূরের কথা। ✓আর এক্ষণে বঙ্গীয় যুবকেরা যে আদর্শে মোহিত হইয়াছেন একবার অপক্ষপাতে বিচার করিয়া দেখুন সেইটী কি। স্বামী কার্য্যোপলক্ষে বাহিরে ছিলেন, আসিয়া দেখিলেন যে তাঁহার স্ত্রী কোন পুং বন্ধুর সহিত নির্জনে স্বৈরালাপ করিতেছেন, তথায় তিনি সামাজিক নিয়মে প্রবেশ করিতে পারেন না। অগত্যা গৃহান্তরে অপ্রকাশ্য রোষে দণ্ডঘট্টিত ভুজঙ্গের ন্যায় স্ফীত ও ঈর্ষায় কষায়িত হইয়া আগন্তুকের নির্গমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কেমন তুমি কি এই রূপ স্ত্রীস্বাধীনতা চাও? স্বামী স্ত্রীর সহিত কথাপ্রসঙ্গে কালহরণ করিতেছেন, ইত্যবসরে তাঁহার স্ত্রীর এক জন পুংবন্ধু উপস্থিত, তিনি তাহার কর গ্রহণ পূর্ব্বক কোন আনন্দকাননে বিচরণ করিবার জন্য নির্গত হইলেন, স্বামী সামাজিক নিয়মে মূক, তিনি স্ত্রীকে নিবারণ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ, কিন্তু তাহার এইরূপ ব্যবহারে অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ

হইতে লাগিলেন; তুমি কি এইরূপ স্ত্রীস্বাধীনতা চাও? হিন্দুসমাজ স্ত্রীজাতির পবিত্রতা অধিক কামনা করিয়া থাকেন। ইনি স্ত্রীলোককে চক্ষুর পীড়াকর ঘৃণিত পল্কা-নৃত্য নাচাইতে চান না এবং তাহাদিগকে রঙ্গভূমিতে লইয়া গিয়া দর্শকবৃন্দের মদরাগ-রক্ত দূষিত কটাক্ষে অপবিত্র করিয়া আনিবার ইচ্ছা করেন না। ভ্রাতঃ! তুমি নিজে অক্ষম দুর্বল ও আত্মরক্ষায় অসমর্থ; বল, তুমি বাহিরে কিরূপে তোমার স্ত্রীকে রক্ষা করিবে। তুমি সেই দিন তোমার পত্নীকে লইয়া ধূমযানে পরিভ্রমণে যাইতেছিলে, তথায় এক জন বিদেশীয় গৌরাঙ্গ অপর ব্যবধানে বসিয়া মদ্যপান করিতেছিল, সে তোমার স্ত্রীকে দেখিয়া নানারূপ বিদ্রূপ করে, পরে তাঁহার অঙ্গে মুখপূর্ণ মদ্য ফুৎকার করিয়া দেয়, কিন্তু কৈ, তুমি ত তখন তেজস্বিতার কিছুমাত্র পরিচয় দিতে পারিলে না। অতএব এক্ষণে এই স্ত্রীস্বাধীনতায় অন্ধ পক্ষপাত তোমার পরিত্যাগ করা উচিত। যদি না কর, ঘোর বিপদ।

ACT III OF 1872

Since the enactment of Act III of 1872, a heterogeneous medley of Brahmos, sceptics, and atheists have availed themselves of its provisions. We really wonder how Brahmos, having the least religious feeling, can marry according to this act. We do not know how they reconcile themselves to the idea that marriages, solemnized in the presence of God, are not valid and those performed in the presence of a human being without the least mention of the name of God, valid. If they say that the former kind of marriage is not valid, and the latter valid, in a social and not in a religious point of view, we reply that true religion admits no difference between matters religious and matters social. In its eyes, every thing social is religious, and every thing religious is social. Marriages, solemnized according to this act are reprehensible whether the Brahmic ceremony follows or precedes the registration. In the former case, if the bride or bridegroom dies in the interval between registration and Brahmic ceremony, it becomes a purely godless *(Niriswara)* marriage. If the registration follows the Brahmic ceremony, it could be asked, how could a marriage, already celebrated in the solemn presence of God, again require celebration before man? Is not this dishonouring God? These marriages, to say the least of them, are very repulsive in either way. The Act, as it at present stands, is for sceptics and atheists and not for Brahmos. Brahmos, who avail themselves of the Act, say that the form of marriage, provided by it, is a mere form like any other form of registration, such as that of birth or death but it is not so. It is a regular form of marriage before a human being, affording a very unfavourable contrast to the Brahmic marriage, solemnized in the presence of God. The Hindus are an essentially religious people. How could we expect them to embrace Brahmoism if we act in such an irreligious manner? The feeling of Hindus against marriages, celebrated according to this Act, is intensified by the circumstance that they necessitate the repudiation of the Hindu name which a man, having the least patriotic feeling, would never consent to do. This repudiation of the Hindu name would moreover highly injure the cause of Brahmoism by obstructing the successful diffusion of that religion. Our reverence towards God and our pious wish to promote the successful diffusion of our religion should dissuade us from having recourse to the provisions of this irreligious act. We admit such a step would involve worldly sacrifice but such sacrifices should be cheerfully undergone for the sake of religion. We wonder how Brahmos, who easily undergo sacrifices for the sake of Brahmoism in other respects, suddenly turn cool and calculating at the time of marriage. We are perhaps mistaken in saying that Brahmo marriage, solemnized with Brahmic rites only, is illegal and therefore requires worldly sacrifice. When marriages, taking place among the different heterodox sects of India, are reckoned valid in courts of law, why should not Brahmo marriages be so? If it be said that the former kind of marriages have already settled down into a custom, the same could be urged in favour of Brahmo marriages; the first Brahmo marriage having taken place so far back as 1861, and many having subsequently taken place since the same. Some Brahmos might argue that there is a probability of ordinary Brahmo marriages, solemnized with Brahmic ceremonies only and not according to the Act, being reckoned valid in courts of law but intermarriages can not be so. To this we answer that, when intermarriages are recognized by the ancient Hindu Shastras and are not uncommon in East Bengal and among certain religious sects of the country, and are reckoned valid in courts of law, there cannot be any doubt of such marriages among Brahmos being also reckoned legal in courts of law. Such a high legal authority as Fitz James Stephen is of opinion that every marriage is a contract and that Courts of Law must feel the greatest difficulty in reckoning any kind of marriage null and void.*

* See Stephen's speech at the Legislative Council at the end of Pundit Ananda Chandra Vedantabagish's pamphlet on Brahmo Marriage.
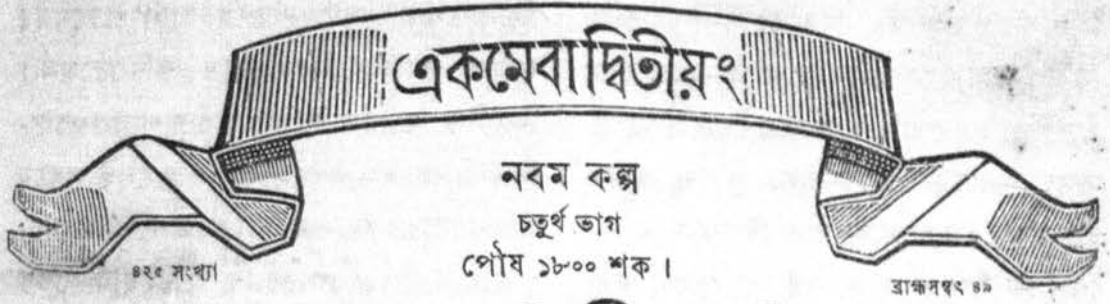
Registerd No 52.

নবম কল্প
চতুর্থ ভাগ
পৌষ ১৮০০ শক।

৪২৫ সংখ্যা

ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৯

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

একোনপঞ্চাশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

১১মাঘ বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে ৮ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং সায়ংকালে ৭ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

আধ্যাত্মিক জগৎ।

ভৌতিক জগতে আপাততঃ অব্যবস্থা ও অশৃঙ্খলা প্রতীয়মান হয়। প্রাকৃতিক নিয়ম সকল অত্যন্ত কঠোর। তাহা ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক বিচার করে না। পতনশীল প্রাচীরের নিকট দিয়া যদি ধার্ম্মিক ব্যক্তি গমন করেন তিনি ধার্ম্মিক বলিয়া সে তাঁহাকে দয়া করিবে না। প্রকৃতি সে সময় মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম পালন করিবেই করিবে। যদি কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি নৌকা হইতে স্খলিতপদ হইয়া নদী-গর্ভে পতিত হয়েন জল-নিমজ্জন দ্বারা তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইবেই হইবে। তিনি ধার্ম্মিক বলিয়া নিষ্ঠুর জলরাশি তাঁহার প্রাণরক্ষা করিবে না। ভৌতিক জগতে পাপপুণ্যের দণ্ড পুরস্কার সম্বন্ধে অনেক অব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। ভৌতিক জগতে পুণ্যবান ব্যক্তি ক্লেশ পাইতেছেন; অসাড় অনুতাপহীন পাপী দিব্য সুখে সচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছে কিন্তু ভৌতিক জগৎ ভিন্ন আর এক জগৎ আছে যেখানে এরূপ অব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না। সে জগতে ধর্ম্মের নিয়ম সর্ব্বোপরি প্রধান। কোন জ্ঞানী বলিয়াছেন, যে সর্ব্বাপেক্ষা দুই বস্তু আমার মনকে বিস্ময়-রসে প্লাবিত করে, সেই দুই বস্তু বাহে অনন্ত আকাশ এবং অন্তরে ধর্ম্মের নিয়ম। ধর্ম্ম লোক-বিধরণার্থ সেতুস্বরূপ হইয়াছে। ধর্ম্মের নিয়ম পালন না করিলে লোক-সমাজ এক-

দণ্ড তিষ্ঠিতে পারে না। অচেতন ভৌতিক জগৎও ধর্ম্মের নিয়মের সম্পূর্ণ অধীন কিন্তু কি প্রকারে অধীন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ভৌতিক জগতে যাহা আপাততঃ অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলা বলিয়া প্রতীত হয় তাহা বস্তুতঃ অব্যবস্থাও বিশৃঙ্খলা নহে। ভৌতিক জগৎ সেই ধর্ম্মাবহ পুরুষ দ্বারা সর্ব্বদা নিয়ন্তৃত হইতেছে। মনুষ্য হইতে উচ্চতম দেবতা পর্য্যন্ত সকলই ধর্ম্মের নিয়মের অধীন। এই নিয়ম মনুষ্য হইতে উচ্চতম দেবতা পর্য্যন্ত সকলকে ঐক্য-সূত্রে বদ্ধ করিতেছে। সকলই সেই ধর্ম্ম-রাজ্যের অন্তর্ভূত, ঈশ্বর স্বয়ং সেই রাজ্যের রাজা। এই ধর্ম্মরাজ্য আধ্যাত্মিক জগৎ শব্দে ব্যক্ত করা যায়।

এই আধ্যাত্মিক জগৎ ভৌতিক জগৎ অপেক্ষা যে কত সুন্দর তাহা বর্ণনা করা যায় না। প্রেমই সেই আধ্যাত্মিক জগতের সৌন্দর্য্যের মূল। ধর্ম্ম ব্যতীত প্রকৃত প্রেমের উৎপত্তি হয় না। সেই প্রেমাকর পরমেশ্বর হইতে প্রেম-স্রোত প্রবাহিত হইয়া সেই জগৎকে সর্ব্বদা সিক্ত রাখিয়াছে। তিনি আধ্যাত্মিক জগতবাসীদিগকে প্রীতি করিতেছেন, তাহারাও তাঁহাকে প্রীতি করিতেছে। তাহারা সেই প্রেমাস্পদ ঈশ্বরকে প্রীতি করিতেছে বলিয়া তাহাদিগের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রেম দ্বিগুণিত হইতেছে। এই আধ্যাত্মিক জগতে চিরশান্তি ও চির আনন্দ বিরাজ করিতেছে। সেখানে মোহ-কোলাহল প্রবেশ করিতে পারে না। তাহার উপকূলে ভৌতিক জগতের দুঃখ ক্লেশের তরঙ্গ প্রতিঘাত করিয়া বিলীন হয়।

ধার্ম্মিক-ব্যক্তি এই আধ্যাত্মিক জগতে সর্ব্বদা জীবিত রহিয়াছেন। তিনি ভৌতিক জগতের সম্বন্ধে মৃতবৎ হইয়া তাহাতে জীবিতের ন্যায় কার্য্য করেন। তাঁহার প্রাণ সেই আধ্যাত্মিক জগতে সর্ব্বদা পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি তথায় সেই প্রাণের প্রাণ পরমেশ্বর হইতে সর্ব্বদা জীবন লাভ করিতেছেন। নিগৃহীত ধার্ম্মিক ব্যক্তির শরীর পাষণ্ড-প্রজ্বলিত-চিতায় দগ্ধ হইতেছে, কিন্তু সেই সময়ে তাঁহার আত্মা অনুপম শান্তি উপভোগ করিতেছে। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ তাঁহার জীবন ভৌতিক জীবন নহে, তাহা আধ্যাত্মিক জীবন। অন্যের সম্বন্ধে যাহা দিবা তাহা তাঁহার সম্বন্ধে রাত্রি এবং অন্যের সম্বন্ধে যাহা রাত্রি তাহা তাঁহার সম্বন্ধে দিবা। যতই আমরা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি দমন করিতে সক্ষম হইব ততই আমরা আধ্যাত্মিক জগতের দিকে উন্নত হইব। ধার্ম্মিক ব্যক্তি ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া, ন্যায়বান হইয়া, সর্ব্বভূতের প্রতি দয়া করিয়া, ঈশ্বরের প্রতি যোগ নিবদ্ধ করিয়া আধ্যাত্মিক জীবন লাভ পূর্ব্বক কৃতার্থ হয়েন।

পরকাল।

সে কাল নাই, সে সময় আর নাই, যে আমরা কেবল অন্ধ বিশ্বাসের প্রেরণায় সন্তুষ্ট মনে কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মের শাসন সকল অবনত মস্তকে স্বীকার করিব। মানবগণকে এখন আর কেবল মাত্র সংবাদ বা উপদেশ দ্বারা সন্তুষ্ট রাখা যায় না। তাহারা এখন অনুসন্ধিৎসু হইয়া সমস্ত বিষয়েরই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এক্ষণে তাহাদের মনে সন্দেহ সতর্কতা ও জিজ্ঞাসা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে; বিশ্বাস সঙ্কুচিত। কিন্তু এমন এক সময় ছিল যখন আমরা সরল ভাবে সত্যের সহিত কত বিকট অসত্য সকলও অপ্রতিবাদে গ্রহণ করিয়াছি। উপদেষ্টাদিগের উপদেশে দ্বিধা-শূন্য মনে দেব-আরাধনা করিয়াছি এবং সেই

উপদেষ্টাদিগকে অত্যুচ্চ সামাজিক আসন প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে আত্ম বিক্রয় করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি। স্বাধীন চিন্তায় জলাঞ্জলি দিয়া ও অন্যদীয় দারুণ আদেশ সকলকে ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের অঙ্গ ভাবিয়া অতি বিশ্বস্ত চিত্তে তদনুসরণ করত আমরা আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছি। তৎকালে আমাদের হৃদয় সরল বিশ্বাসে সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও পবিত্রভাবে আপ্লুত থাকিত।

তারতম্য বিবেচনা করিয়া দেখিলে অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, আমরা উপরোক্ত আদিম অবস্থায় বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিকতর নিরুদ্বেগে ও আরামে ছিলাম। পবিত্রতা-সম্পৃক্ত একপ্রকার বিশ্বাস-মূলক শান্তি দ্বারা আমাদের হৃদয় অনুপম স্বাস্থ্য সম্ভোগ করিত। দেব-ভক্তি ও প্রীতির উচ্ছ্বাসে মন সর্ব্বদা পুলকে পূর্ণ থাকিত। স্বাভাবিকরূপে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সকলকে চরিতার্থ করিয়া আত্মাকে আমরা শীতল করিতাম। সংক্ষেপতঃ আমরা সেই আদিম কালে ধর্ম্মোৎপাদ্য এক প্রকার পরম উপাদেয় অকৃত্রিম সুখ সম্ভোগ করিতাম। কিন্তু এক্ষণে আমরা গৌণ কল্পে তাহার আভাস মাত্র পাইয়া তজ্জন্য লালায়িত হইতেছি, তৎ-সম্ভোগ সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। সংশয় আমাদের সুখের বিশ্বাসকে সংক্ষোভিত করিয়া তুলিয়াছে। এজন্য অনেকে বর্ত্তমান অবস্থার বিনিময়ে সেই আদিম অসংস্কৃত ও সরল বিশ্বাসের অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আপনাদিগকে সুখী জ্ঞান করিতে পারেন। কারণ বিশ্বাস ব্যতীত অন্যত্র শান্তিসুখ পাওয়া যায় না। এক্ষণে হায়! আমরা সে বিশ্বাস হারাইয়াছি।

কিন্তু সত্য বলিতে হইলে, সেই সুখের বিশ্বাস সেই অন্ধ বিশ্বাস হারাইয়াছি বলিয়া আমরা আপনাদিগকে বঞ্চিত জ্ঞান করিতে পারি না। কেবল সুখলাভ করাই মনুষ্যত্ব নহে; সুখসহ মহত্ত্ব সংযোগ করিয়া স্বাধীন চেষ্টাতে ও জীবন্তভাবে তাহা আয়ত্ত করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। বিশ্বাসে সুখী হওয়া অপেক্ষা জ্ঞান-সহকৃত সুখ ভোগ করা শ্রেষ্ঠতর। জগতে সুখী কে না? প্রাণিমাত্রেই নিজ নিজ ভাব ও শক্তি অনুসারে সুখ সম্ভোগ করিয়া তৃপ্ত থাকে। কিন্তু সচেতন ভাবে উন্নতিশীল ভাবে উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধ মাত্রায় সুখী হওয়া কেবল মনুষ্যের ভাগ্যেই ঘটে, ইহাই মনুষ্যের একটী উচ্চতম গৌরব। অতএব বিশ্বাসের সহিত জ্ঞানের সমন্বয় করিয়া লইতে হইলে সন্দেহ সতর্কতা ও স্বাধীন চিন্তার আবশ্যক। সন্দেহের মূলে স্বাধীনতা নিহিত আছে। স্বাধীনতা আমাদিগের জীবন স্বত্ব। সন্দিগ্ধতাও তাই। আমরা সন্দেহহীন হইলে আপনাকে হারাইয়া ফেলিব। আমাদের আমিত্ব থাকিবে না।

অতএব এখন আমরা সকল বিষয়েই সন্দেহ করি, সতর্ক হইয়া কার্য্য করি বলিয়া আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প ভাগ্যবান মনে করা, যুক্তিযুক্ত নহে। পূর্ব্বে আমরা বিশ্বাসের হস্তে আমাদের স্বাধীনতা সমর্পণ করিয়া বিলক্ষণ আরাম বোধ করিতাম; বিশ্বাস যাহা আশা দিত তাহাতেই আশান্বিত হইতাম, সঙ্গত কি অসঙ্গত কিছুই বিবেচনা করিতাম না; এবং সুবিধার লোভে বিশ্বাস করিতাম; বিশ্বাসকে স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া ও তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইতাম, কিন্তু স্বাধীন কর্ম্মন্য শক্তি মানবীয় চৈতন্যের এরূপ ধর্ম্ম নহে যে উহার পুরোভাগে অনন্ত-প্রসারিত সত্যরাজ্য বিস্তারিত রহিবে আর উহা আরামের জন্য নিশ্চিন্ততা বা উদ্-

বেগশূন্যতার জন্য ইচ্ছা পূর্ব্বক অন্ধ হইয়া বিশ্বাসের পদতলে অধিক দিন পড়িয়া থাকিবে। এই জন্য মহেচ্ছ সংশয়বাদীগণ মধ্যে মধ্যে দেখা দেন। তাঁহারা সমস্ত স্বজাতীয়দিগকে বিশ্বাসের হস্তে দুর্দ্দশাপন্ন দেখিয়া দয়াদ্র চিত্তে মনুষ্যত্বের উচ্চতম অধিকার ও সত্যের উদার গৌরব স্থাপন জন্য বদ্ধ-পরিকর হয়েন। পুরাকাল হইতে এইরূপ হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু অসৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তাঁহারা সত্যের জয় ঘোষণা করিতে বহির্গত হইয়া সত্যের অপলাপনে সম্প্রবৃত্ত হয়েন; উত্তেজনার বেগে তাঁহারা সীমা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন না, এবং প্রতিবাদের মাদকতায় ঘোর সংহারের কার্য্য আরম্ভ করেন। "নাস্তি" তাঁহাদের বীজ মন্ত্র হইয়া উঠে। কিন্তু অসদ্ভাবে মানব মন সম্যক পরিতৃপ্ত হয় না। সুতরাং প্রতিঘাতের নিয়মাধীনে এই অতৃপ্ততা হেতু চিন্তার গতি পরিবর্ত্তিত হয়।

এক্ষণে প্রবল চিন্তাশীল একদল প্রত্যক্ষজ্ঞানাভিমানীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, ইঁহারা আমাদিগকে অধিকতর অতৃপ্ত করিয়া তুলিয়াছেন! ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ জ্ঞানই ইঁহাদের সর্ব্বস্ব। কোনরূপ অতীন্দ্রিয় জ্ঞান-ক্রিয়ার সাক্ষ্য ইঁহারা গ্রহণ করিতে চাহেন না। আমাদের অন্তরতর অন্তরতম সনাতন ভূমা পুরুষ সেই মঙ্গল্য দেবতার পরিবর্ত্তে ইঁহারা বাহ্য জগৎ হইতে একটী ইচ্ছাশূন্য অন্ধশক্তিকে বা ইচ্ছাবিশিষ্ট কিন্তু অশক্ত একটী অপূর্ণ পুরুষকে দম্ভভরে আনিয়া আমাদের আরাধনার্থ প্রদান করিতেছেন। মহাতত্ত্বানুরাগী মানব মন এরূপ হীনবল অপূর্ণ অন্ধদেবত্বে শ্রদ্ধা ও ভক্তি স্থাপন করিতে পারে না। সে হয় পূর্ণভাবের পূজা করিবে না হয় অসদ্ভাবে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইবে; কিন্তু এরূপ খণ্ডভাবে তাহার পুপূজিষা বৃত্তি চরিতার্থ হয় না।

বর্ত্তমান প্রস্তাবে পরকাল-তত্ত্বই আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। ঈশ্বর-তত্ত্ব সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার ইচ্ছা নাই। তবে ঈশ্বর-তত্ত্বের সহিত পারলৌকিক তত্ত্বের অতি নিকট সম্বন্ধ নিবদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া এস্থলে তৎ বিষয়েরও কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা আবশ্যক হইল। সত্য বটে যে ঈশ্বর ছাড়িয়াও পারলৌকিক জীবন প্রতিপন্ন করা যায়। কিন্তু ঈশ্বরশূন্য পরলোক আমাদের সন্তোষ বিধান করিতে পারে না। ঈশ্বরকে সিংহাসনচ্যুত করিলে পরলোকে সুখ কোথায়? সে কি স্বর্গ, যেখানে ঈশ্বর নাই? স্বর্গের এত যে আকর্ষণ, এত মনোহারিত্ব ও এরূপ মহান গভীর কবিত্ব. সে কি ঈশ্বর লইয়া নহে? অতএব আমরা প্রথমতঃ ঈশ্বর-স্বরূপের সংক্ষেপ সমালোচনা করিয়া বিষয়ান্তরের অনুসরণ করিব।

বর্ত্তমান সময়ে সমস্ত সভ্য-সমাজে বিজ্ঞানের অত্যধিক প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়। বিজ্ঞান-চর্চ্চায় সমধিক লাভ, আমোদ ও সুবিধা পাইয়া অনেকেই তদনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রায় প্রতিদিনই নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল আবিষ্কৃত হইতেছে; অদ্ভুত অদ্ভুত শিল্প-কৌশল উদ্ভাবিত হইতেছে; প্রকৃতির উপর, মানব বুদ্ধির বিজয়-ঘোষণা দম্ভভরে চতুর্দ্দিকে নিনাদিত হইতেছে। অধুনা জড় জগতই একা প্রায় সমস্ত মানবীয় চিন্তা অধিকার করিয়া রাখিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মানব মনের প্রকৃতি এই যে, সহবাস দ্বারা উহার অনুরাগ বৃদ্ধি হয়। এবং অনুরাগের মোহ প্রসিদ্ধই আছে। অতএব বর্ত্তমান সময়ে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকলের প্রতি যে লোকের অশ্রদ্ধা হইবে বা তাহারা তদনুশীলনের যোগ্যতা

রক্ষা করিতে পারিবে না, ইহা এক প্রকার অবধারিত বলা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা জড়ের মায়ায় এমনি মুগ্ধ যে, সম্পূর্ণ ভিন্ন-প্রকৃতিক আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বিচার-কালে তাঁহারা জড়-নিষ্ঠতার প্রাবল্য প্রদর্শন করেন। নিয়ত বহির্জ্জগতে মনকে নিবেশিত রাখিয়া তাঁহাদের অন্তর্দ্দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া যায়। এই জন্য তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে যে সকল মত প্রচার করেন তাহা বিশেষ সতর্কতার সহিত গ্রহণ করা উচিত। এবং তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে ভক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানিদিগের উপদেশই প্রধানতঃ গৃহীত হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু কাল-মাহাত্ম্যে এরূপ সৎপরামর্শ দিতেও আমাদের কুণ্ঠতা বোধ হয়। যাঁহারা সকল বিষয়েরই প্রমাণ চাহেন; যাঁহারা মনে করেন সমস্ত তত্ত্বই তাঁহাদের বুদ্ধির উদ্‌গ্রহনীয়, প্রামাণিক-সম্প্রদায়-ভুক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া যাঁহারা স্পর্দ্ধাবান হয়েন; তাঁহাদের নিকট উক্ত রূপ উপদেশের সারবত্তা স্বীকৃত হওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্প। তাঁহারা ভাবিবেন যাঁহাদের মতের ভ্রান্তি প্রদর্শন করাই তাঁহাদের স্পর্দ্ধার বিষয় সেই ভ্রান্ত তত্ত্বজ্ঞানীদিগের শুদ্ধ কথায় বিশ্বাস করিয়া প্রত্যক্ষের অতীত সত্য সকল কি প্রকারে স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। অতএব এই প্রামাণিক উপাধিধারী পণ্ডিতগণের স্পর্দ্ধা কতদূর সঙ্গত অগ্রে তাহাই পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য হয়।

অধুনাতন প্রখ্যাতনামা অধিকাংশ পণ্ডিতগণ কোন রূপ অতীন্দ্রিয় স্বাভাবিক জ্ঞান-ক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা সুতরাং অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে জ্ঞাত-জ্ঞেয় সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বই উপার্জ্জিত ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়। যাহা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ-বোধিত বা প্রমাণ-সিদ্ধ নহে, তাহা অনুশীলনীয়ও নহে। কোন রূপ অতিগ (Transcendental) জ্ঞান-ক্রিয়ার বিদ্যমানতা স্বীকার করা —তাঁহাদের মতে প্রমেয় যাচ্ঞা করিয়া লওয়া অপরাধের তুল্য।

এরূপ ঈশ্বরবাদীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে "জগতের কারণ অজ্ঞেয়"। একজন ঈশ্বর আছেন বটে, কিন্তু জগৎ সৃজন ও পালন-কার্য্য তাঁহার ইচ্ছাকৃত কি না ইহা আমরা জানি না, জানিবার উপায়ও নাই। তাঁহাদের দর্শনে "ঈশ্বর জ্ঞানাতীত জগদ্ব্যাপক শক্তি মাত্র"। অপর কেহ কেহ প্রাগুক্ত দূষিত মূল-সূত্র অবলম্বন করিয়া অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক দূর উঠিবার চেষ্টাতে ঘোর অনর্থে পতিত হইয়াছেন। তাঁহারা যে ঈশ্বর স্বীকার করেন তিনি ও-রূপ অজ্ঞেয় নহেন। তিনি "ইচ্ছাবিশিষ্ট জগন্নির্ম্মাতা"। তাঁহারা বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য জগৎ পর্য্যালোচনা করিয়া ঐশিক স্বভাবের মীমাংসায় সাহসী হইয়াছেন। এবং সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঈশ্বরের শক্তি জ্ঞান ও দয়া অসীম নহে।

আমরা প্রথমোক্ত দার্শনিকদিগের সহিত একমত হইয়া বিনম্রভাবে স্বীকার করিতে পারি যে,

"ন চ তস্যাস্তি বেত্তা।"
"প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।"

"তাঁহাকে বিশেষ রূপে জানে এমন লোক নাই।" "প্রজ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না।" তিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সকলকে অতিক্রম করেন। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি সেই অনন্ত ভূমা পুরুষকে কি প্রকারে ধারণ করিবে? কিন্তু তাঁহাদিগকে ইহাও জানাইতে হয় যে, ঈশ্বর যদিও আমাদের জ্ঞানের অতীত তিনি আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত নহেন। মনের সহিত বাক্য তাঁহাকে পায় না বটে, কিন্তু তিনি স্থির বিশ্বাসের অবিষয় নহেন। বাহ্য জগৎ তাঁহার অতি সঙ্কীর্ণ পরিচয় যাহা

দেয়, বিশ্বাস তাহাতে তৃপ্ত নহে। বিশ্বাস অন্তর্জগতের অতিগ শক্তি বিশেষ দ্বারা তাঁহার অনন্তত্বের পরিচয় পাইয়া তাঁহাতেই বিশ্রাম করে।

ঈশ্বর ও অন্যান্য অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব সম্বন্ধীয় এই যে বিশ্বাস ইহা স্বতন্ত্র জাতীয়। পরীক্ষা-সিদ্ধ সাধারণ বিশ্বাসের মূলে সন্দেহ অবস্থিত আছে। আমরা নিশ্চয় জানি না কিন্তু ইচ্ছা পূর্ব্বক সুবিধা বোধে আপাতত বিশ্বাস করি। যাহা বিশ্বাস করি তাহা সত্য না হইলেও হইতে পারে। অনেক সময় বাহ্য ইন্দ্রিয় সকল আমাদিগকে জড় জগতের প্রকৃত পরিচয় দিতে পারে না। ইন্দ্রিয়-প্রেরিত সংবাদ সকলকে অনেক সময় আমাদিগকে বুদ্ধির দ্বারা পরিশোধিত করিয়া লইতে হয়। অতএব বুদ্ধির পোষকতায় বাহ্য জ্ঞানের সিদ্ধি হয়। কিন্তু প্রাগুক্ত বিশ্বাস সকল স্বতঃসিদ্ধ। বুদ্ধি উহার অন্যথা করিতে পারে না। অধিকন্তু বাহ্য জগতের স্থূল তত্ত্ব সকল গৌণরূপে আমাদিগের হৃদয়স্থ হয় কিন্তু আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল অগৌণে আমাদের আত্মাকে স্পর্শ করে। অতএব বাহ্য জ্ঞান অপেক্ষা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রামাণ্য অধিক হওয়া উচিত কিন্তু অভ্যাস বশতঃ আমাদিগের প্রতীতি ভিন্নরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমরা নিয়ত জড়ের চর্চ্চায় জড়ের ব্যবসায় নিরত থাকায় আমাদের মন জড়ানুরাগী হইয়া জড়ের গুণগ্রামকেই বিশেষ পরিচিত জ্ঞান করিয়া থাকে। এবং উহাতেই আমাদের সমুদায় আশা ভরসা নিবদ্ধ করায় আমাদের অন্তর্বৃত্তি সকল তদনুরূপ ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে। আধ্যাত্মিক জগতের মহৎতত্ত্ব সকল আর তাহাতে স্পষ্টরূপ প্রতিভাত হয় না, ও তৎপ্রতি আমাদের যথোচিত অনুরাগও আর নাই। অপিচ যাহা অনুরাগের সহিত দর্শন করা না হয়, তাহার উপলব্ধিও তৃপ্তিকর হয় না। এই জন্য বর্ত্তমান কালের জড়পক্ষপাতী পণ্ডিতগণের অন্তরে আধ্যাত্মিক ঐশী তত্ত্ব সকল সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় না। কদাচিৎ হইলেও তথায় তাঁহাদের মহৎ ও পবিত্র ভাব সকল রক্ষা পায় না। অতএব যাহারা ভৌতিক জগতে পরিপুষ্ট বুদ্ধিশক্তি সহকারে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বিচার করিতে প্রয়াসী হয়েন, তাঁহাদিগকে আমাদের অনুরোধ এই যে, তাঁহারা হৃদয়-গ্রন্থি সকল ছেদন করিয়া, জড়ের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, রাগের সহিত নিজ নিজ আত্মাতেই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকল দর্শন ও সমালোচন করিতে যত্ন করুন, দেখিতে পাইবেন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকল ভৌতিক সত্য অপেক্ষা অধিকতর শ্রদ্ধেয় কি না। আমাদের ঐ অনুরোধ অসঙ্গত নহে। আমরা তাঁহাদের নিকট অধিক কিছু চাহিতেছি না। আমরা চাহি তাঁহারা যথাস্থানে যথাবিষয়ের অনুসন্ধান করেন। করিলে তাঁহাদের নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রতীতি হইবে যে, বাহ্য জগৎ ও তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান-সাধক বাহ্য ইন্দ্রিয় সকলকে অবলম্বন করিয়া বুদ্ধির দ্বারা ঈশ্বর-তত্ত্ব আদিতে উপনীত হওয়া উৎকৃষ্ট কল্প নহে।

সেই সমস্ত অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের নিমিত্ত ভিন্ন প্রকার ইন্দ্রিয়ের সদ্ভাব অতি প্রাচীন কাল হইতেই মানবগণের উপলব্ধি হওয়াতে এই ভিন্ন প্রকার ইন্দ্রিয়-নিকরের নাম অন্তঃকরণ, অর্থাৎ অন্তরের ইন্দ্রিয় দেওয়া হইয়াছে। মানবীয় ভাষা বাহ্য জগত-সম্ভূত ভাব সমূহের প্রতিরূপ মাত্র। বাহ্য ব্যাপার সকল সুসম্পন্ন করিবার জন্য পরস্পরের মনের ভাব বিনিময় করার আবশ্যকতা আমাদের প্রথমতই অনুভূত হইয়াছিল। এই জন্য

আমাদের ভাষা প্রধানতঃ জড়-জগত-সমুদ্ভূত ভাব পরম্পরার সঙ্কেতরূপে গঠিত হয়। অতঃপর যখন চিন্তাশীল মনুষ্যদিগের হৃদয় অন্তর্জ্জগতের ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং তাঁহারা তাহা ব্যক্ত করার প্রয়োজন অনুভব করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা তৎতাবৎ পূর্ব্বশিক্ষিত জড়নিষ্ঠ ভাষাতে রূপক আকারে প্রচার করিতে লাগিলেন। এই জন্য যদ্দ্বারা আমরা আধ্যাত্মিক জগতের সত্তা সকলকে আত্মসাৎ করি, তদ্বোধার্থ বাহ্য-জ্ঞান-বাহক ইন্দ্রিয়ের পর্য্যায়ান্তর সংজ্ঞা; "করণ" শব্দে "অন্তঃ" এই বিশেষণটী যোগ করিয়া ব্যবহার করার রীতি আমরা আমাদিগের মধ্যে প্রচলিত দেখিতে পাই। আর "জ্ঞানেন্দ্রিয়" শব্দ, আর্য্য সন্তানদিগের প্রায় নিত্য-ব্যবহৃত শব্দ রূপে পরিণত হইয়াছে। ফলতঃ প্রকৃত প্রস্তাবে উহাকে ইন্দ্রিয় নামে অভিহিত করাই উচিত হয় না। ইন্দ্রিয় যাহার নিকট সংবাদ বহন করে, উহা নিজে তাহাই। উহা আত্মা। আধ্যাত্মিক মূল সত্য সকল উহার গোচর হওন জন্য কোনরূপ মধ্যবর্ত্তিতার প্রয়োজন হয় না। উহা স্বয়ং সেই সত্য সকলকে স্পর্শ করে, অন্যের পরিচয়ে তাহা গ্রহণ করে না। তৎ সমস্ত তাহার নিকট উপস্থিত হইলেই তৎকর্ত্তৃক পূর্ব্বপরিচিতের ন্যায় আলিঙ্গিত হয়। অতএব পাঠক মহাশয়দিগের প্রতি আমাদের নিবেদন এই যে, আধ্যাত্মিক তত্ত্বের জন্য তাঁহারা বাহ্য জগৎ ও বাহ্য ইন্দ্রিয়ের অপ্রচুর সাক্ষ্য নিরপেক্ষ হইয়া নিজ নিজ আত্মাতেই সেই তত্ত্বসকলের মূল অধিষ্ঠিত দেখিয়া তদবলম্বন পূর্ব্বক ঐশী স্বভাব নিশ্চিত করণার্থ সযত্ন হউন। বাহ্য জগতে ঈশ্বরের অবচ্ছায়া মাত্র পতিত হয়। কিন্তু আত্মাতে তাঁহাকে প্রত্যক্ষতঃ দর্শন করিতে পাওয়া যায়। আত্মাতে তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন পাইয়া প্রতীতি হইবে, যে ভূমা ঈশ্বর আমাদের বুদ্ধি মনের অগোচর হইলেও "আমরা তাঁহাকে জানি না" বা "জানিবার কোন উপায় নাই" এরূপ উক্তি কোন ক্রমে সত্য নহে। আত্মা তাঁহাকে অন্তরতর অন্তরতম আত্মীয়রূপে সাক্ষাৎ আলিঙ্গন করে, তাঁহাকে তৃপ্তিহেতু রসস্বরূপ আস্বাদন করে। তিনি বুদ্ধি মনের অবিষয় হইলেও আত্মার আস্বাদ্য বটেন।

অপরন্তু যদিও ঈশ্বরতত্ত্ব অতীন্দ্রিয়-জ্ঞান-ক্রিয়ার বিষয় হয়; বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা যদিও তাহা সম্যক লাভ করা না যায় তথাচ ইহা নিশ্চয় যে, বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সহকারিতায় বুদ্ধি যে সকল প্রত্যক্ষ সত্য সংগ্রহ করে তাহা কখনই আত্মার সাক্ষাৎ-লভ্য উক্ত তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী হইতে পারে না। যে হেতু উভয় প্রকার সত্য সেই এক সত্য-স্বরূপ হইতে নিঃসৃত যিনি বিশ্বের অন্তরাত্মা হয়েন। অতএব উভয় প্রকার সত্য তুল্য রূপ পবিত্র ও সমভাবে আদরণীয়। তবে একথা বলা যাইতে পারে যে, বাহ্যেন্দ্রিয় সকল ভৌতিক জগৎ হইতে আমাদিগকে যে সমস্ত জ্ঞানের আয়োজন করিয়া দেয়, তাহাই পর্য্যাপ্ত নহে। উহারা আমাদিগকে শ্রেষ্ঠতর ভাব-জগতের মুখ্য জ্ঞান আহরণ করিয়া দিতে পারে না। তদর্থে আত্মার অগৌণ বিদ্যমানতার প্রয়োজন হয়। এই মুখ্য জ্ঞানকে এই স্বতঃসিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয়কে ভিত্তিস্থানীয় করিলে, ভূয়োদর্শন দ্বারা আমরা আমাদের ঐহিক প্রয়োজনানুরূপ সমূহ অধ্যাত্মিক তত্ত্ব, তাহাতে সন্নিবেশিত দেখিতে পাই। অন্যথা মহান প্রমাদে পতিত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, অনেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ আমাদিগের অতীন্দ্রিয় আদিম জ্ঞান এই সমস্ত স্বতঃসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয়কে

অসিদ্ধ ভাবিয়া কেবল মাত্র ভূয়োদর্শনের উপর আপনাদিগের জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল্য স্থাপনের প্রয়াস করিতেছেন। তাঁহারা অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের অবশ্যম্প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করাকে বুদ্ধিহীনতার কার্য্য বলেন। তাঁহারা বলেন, যখন ভূয়োদর্শন হইতেই প্রয়োজনীয় সমূহ জ্ঞানের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, তখন অপ্রমাণ-বোধিত অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের জন্য বিশেষ বিধান কল্পনা করা অবিজ্ঞের কার্য্য—বৈজ্ঞানিক নীতির অনুমোদনীয় নহে।

তত্ত্বজ্ঞানীরা আত্মপ্রত্যয়-বোধিত মুখ্য জ্ঞানের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উহা মূল জ্ঞান; অন্য কোন জ্ঞান হইতে উদ্ভূত বা উপার্জ্জিত কি শিক্ষিত নহে। এবং উহা আত্ম-প্রত্যয়-মূলকতা নিবন্ধন সর্ব্বহৃদয়াধিষ্ঠিত ও অবশ্য-বিশ্বসনীয় সত্য তত্ত্ব। কিন্তু প্রত্যক্ষবাদীরা কোনরূপ অতীন্দ্রিয় জ্ঞান শক্তির সত্তা বা আবশ্যকতা অস্বীকার করিয়া আমাদের বিশ্বাস-যোগ্য সমূহ প্রামাণিক তত্ত্বের উপলব্ধির প্রতি কারণ স্বরূপ কতকগুলি ভাবাসঙ্গের নিয়ম (Laws of association of Ideas) নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ নিয়ম গুলি বিশেষ রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে উদ্ভাবকদিগের বুদ্ধিমত্তার ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু তত্তাবৎ আমাদিগের বিশ্বাসী মন হইতে সহজ জ্ঞান ও স্বতঃসিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয়ের প্রয়োজনীয়তানুবোধকে, কোন ক্রমে অপসারিত করিতে পারিতেছে না। ভূয়োদর্শন ও ভাবাসঙ্গের উদ্দীপনা আমাদের কোন কোন জ্ঞানের প্রতি কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়াও আমাদিগকে অনেক সময় তাহাদের সংকীর্ণতা ও অপ্রাচুর্য্য অনুভব করিতে হয়। মানব মন এমন কতকগুলি বিশ্বজনীন ও অবশ্য-বিশ্বসনীয় সত্য সহজ জ্ঞান দ্বারা দর্শন করে, যাহা প্রামাণিক সম্প্রদায়ীদিগের ভূয়োদর্শন দ্বারা কদাচ লভনীয় নহে। প্রামাণিক প্রণালীতে উপার্জ্জিত তত্ত্ব আমাদের সহজ-জ্ঞান-লব্ধ মুখ্য তত্ত্বের ন্যায় যদিচ কদাচিৎ বিশ্বজনীন হয়, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে উহা অবশ্য-বিশ্বসনীয় ও অপরিহার্য্য কখনই হইবে না। কারণ যাহা উপার্জ্জন করা যায় তাহা ত্যাগও করা যায়। যাহার আগম আছে তাহার নির্গমও আছে। আমাদের অধিষ্ঠানভূতা পৃথিবীকেই দৃষ্টান্ত-স্থানে গ্রহণ করিয়া আমরা এই উক্তির সাযার্থ্য প্রদর্শনের চেষ্টা করিব। পৃথিবী সম্বন্ধে আমাদের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ জ্ঞান এই হইতেছে যে, উহা অচলা এবং সূর্য্য চন্দ্রাদি জ্যোতিঃপিণ্ড সকল নিয়ত উহাকে বেষ্টন করিতেছে। এবং ইহা সম্ভব যে এক সময় পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকেরই প্রতীতি ঐরূপ ছিল। সুতরাং তৎকালে এই বিশ্বাস সর্ব্বজনীন বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু বিজ্ঞানের উদয়ে সম্প্রতি চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই মন হইতে উক্ত বিশ্বাস বিদূরিত হইতেছে। এক্ষণে আবার পৃথিবীর আবর্ত্তন অনেকের বিশ্বাস্য হইয়াছে। পৃথিবীর দৈনিক গতির প্রকার সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়াও অনেকে উক্ত মতে বিশ্বাস স্থাপন করা অসাধ্য বোধ করে না। অতএব এমন সময়ও আমরা কল্পনা করিতে পারি, যখন এই বিশ্বাস সর্ব্বজনীন হইয়া উঠিবে। অন্য পক্ষে আবার ইহাও মনে করা আমাদের সাধ্য বটে যে, ভবিষ্যতে কোন উৎকৃষ্টতর বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ে এই বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস নিরাকৃত হইয়া সেই পূর্ব্ব-বিশ্বাস পুনঃ-সংস্থাপিত হইবে।

এস্থলে প্রদর্শিত হইল যে, পরস্পর-বিপরীত উক্ত উভয় প্রকার বিশ্বাস (পৃথিবীর

অবর্ত্তুলতা ও নিশ্চলতা বিষয়ক বিশ্বাস) উপার্জ্জিত। এবং উপার্জ্জিত উক্ত তত্ত্বদ্বয়ে বিশ্বাস তজ্জাতীয় অন্যান্য বিশ্বাসের ন্যায় এক সময় সর্ব্বজনীন হইতে পারে কিন্তু অবশ্য-বিশ্বসনীয় হইতে পারে না। অতএব কেবল বাহ্যেন্দ্রিয়-গোচরত্ব বা যুক্তি-লব্ধত্ব নিবন্ধন কোন বিশ্বাস যে অপরিহার্য্য হয় না এতদ্দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং আমাদের মনের যে সমস্ত বিশ্বাস অপরিহার্য্য তাহা ভূয়োদর্শন দ্বারা উপার্জ্জিত বলা যাইতে পারে না। আত্মার সাক্ষাৎ-প্রত্যক্ষ বলিয়াই উক্ত প্রকার বিশ্বাসের অপরিহার্য্যতা; ও মানব মনের অবশ্য-বিশ্বসনীয় বলিয়াই তাহার সর্ব্বজনীনতা। আমাদের আত্মা আপনাকে ও আত্মেতর বাহ্য সত্তাকে ও সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ দর্শন করে, অতএব তাহার তত্তৎ বিষয়ক বিশ্বাস মন হইতে একবারে অপনীত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। প্রামাণিক বিজ্ঞান আমাদিগকে যত প্রকার জ্ঞান আহরণ করিয়া দিউক তাহা মুখ্য জ্ঞান হইবে না। তাহা সাবলম্ব শিক্ষিত জ্ঞান। তাহা যেমন লাভ করা যায়, তেমনি পরিত্যাগও করা যাইতে পারে। তাহা মুখ্য জ্ঞানের ন্যায় অপরিহার্য্য হইবে না। কিন্তু আত্মার সাক্ষাৎ-লভ্য মুখ্য জ্ঞান অপরিহার্য্য, তাহা একবারে মানব মন হইতে অপসারিত করা অসাধ্য। সহস্র সহস্র ব্যক্তি সূর্য্যোদয় দর্শন করিতেছে, তাহাদের বিশ্বাস তাহারা একই সূর্য্য দর্শন করিতেছে। বিজ্ঞান যদি গম্ভীর স্বরে বলেন—না তোমরা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন সূর্য্য অবলোকন করিতেছ, আমরা তাহা বিশ্বাস করিতে পারি। বিজ্ঞান যদি বলেন অমুক নির্দ্দিষ্ট দিবসে কক্ষচ্যুত কোন বৃহত্তর গ্রহের সংঘাতে আমাদের আবাস-ভূমি পৃথিবী বিচূর্ণিত হইয়া ঈশ্বরের মঙ্গল উদ্দেশ্য বিশেষ সুসাধিত হইবে, বিনত চিত্তে আমরা তাহাও বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু ঈশ্বর নাই, আমার আত্মা নাই, বাহ্য সত্তা অবভাস মাত্র; অথবা এই বিশ্বের আশ্রয় যিনি তিনি অপূর্ণ অর্থাৎ অশক্ত, নির্দ্দয় ও অজ্ঞান; বিজ্ঞান যদি আমাদিগকে এরূপ উপদেশ দিতে সাহস করেন, তাহা হইলে বিজ্ঞানের উপদেশে কি আমাদের শ্রদ্ধা হয়? না তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি? পৃথিবীর গতি বিষয়ক সাধারণ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক মত যতদিন প্রচারিত হইয়াছে, নাস্তিকতা যদি তদপেক্ষা প্রাচীন কাল হইতে নাও হয়, অন্ততঃ তৎসম কাল হইতে প্রচারিত হইতেছে, বরং নানাবিধ আগন্তুক ও নৈসর্গিক কারণে নাস্তিকতা যেরূপ আগ্রহাতিশয্যের সহিত প্রচারিত হইয়াছে, পৃথিবী বিষয়ক উক্ত মত প্রচার সম্বন্ধে সেরূপ হয় নাই। নাস্তিকতা প্রচারণ জন্য যত মনস্বিতা পরিচালিত যত মস্তিষ্ক বিলোড়িত হইয়াছে, অপর মত সম্বন্ধে সেরূপ হয় নাই। আবার নিরঙ্কুশতা-প্রার্থী শিথিল-ধর্ম্ম আত্মম্ভরি লোকদিগের (এক্ষণে ইহাদের সংখ্যা অল্প নহে) নিকট নাস্তিকতা যেরূপ সাংসারিক সুবিধার হেতুরূপে প্রতীয়মান হইতে পারে, দ্বিতীয় মত সেরূপ নহে। তথাচ প্রত্যক্ষের বিপরীত, পৃথিবীর গতি বিষয়ক এই মত কালে সর্ব্বজনীন হইবার বাধা দেখিতেছি না। কিন্তু আমাদের সহজ জ্ঞান ও স্বতঃসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয়ের বিরোধী নাস্তিকতা সর্ব্বজনীন হওয়া দূরে থাকুক, কোন কালে উহা সাম্প্রদায়িক বিশ্বাসরূপে অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। অনন্ত নরক-যন্ত্রণা স্বীকার করিয়াও লোকে আস্তিক মতের প্রতি পক্ষপাতিতা প্রদর্শন করিয়াছে এবং পান ভোজন ও সুখে থাকার প্রলোভন অবহেলা

করিয়াছে। এতদ্দৃষ্টে নিঃসন্দিগ্ধরূপে বলা যাইতে পারে যে ভূয়োদর্শন আমাদের জ্ঞান-সমষ্টির প্রচুর হেতু নহে। আমাদের অপরিহার্য্য আদিম অধ্যাত্ম জ্ঞান সকল অন্য উৎকৃষ্টতর মূল হইতে সমুৎপন্ন হয়। এবং এই আদিম জ্ঞানের বিষয়ীভূত সত্যের সহিত মানব আত্মার যে দুশ্ছেদ্য যোগ তাহা কিছুতেই বিয়োজিত হইবার নহে। এ যোগ ভাবাসঙ্গের ফল নহে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে বিশ্বজনীনতা ও অপরিহার্য্যতা যদি আমাদের নিরবলম্ব আদিম জ্ঞানের সমীচীন লক্ষণ হয়, তাহা হইলে অলীকতাও তাহার অপর লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে, যে হেতু অলীক ভূতের ভয় সর্ব্বজনীন ও অপরিহার্য্য তাহা হইতে অনেক মতিষ্ঠ ব্যক্তিকেও সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইতে দেখা যায় না। তর্কের সময় তাঁহারা ভূতের অলীকত্ব সপ্রমাণ করিতে সুদক্ষ বটেন, কিন্তু বিজন অন্ধকারে ভূতাধিষ্ঠিত বলিয়া প্রখ্যাত স্থানে তাঁহাদের মনে স্বতঃ ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে। ভয়ের অস্তিত্বে, গূঢ় বা ব্যক্তভাবে ভয়ের কারণ ভূতে বিশ্বাস অনুমিত হইতে পারে। অতএব সর্ব্বহৃদয়াধিষ্ঠিত ও অপরিহার্য্য হইয়াও কোন কোন বিশ্বাস অমূলক হইবার অসম্ভাবনা নাই।

আপত্তিকারিদিগের প্রতিবাদের উত্তরে প্রথমত বলা যাইতে পারে যে ভূতে বিশ্বাস যে নিতান্ত অলীক, ইহা এ পর্য্যন্ত সর্ব্ববাদি-সম্মতি ক্রমে অবধারিত হয় নাই। বরঞ্চ বর্ত্তমান কালের সুসভ্য দেশের অনেকানেক অধিবিদ্যদিগের বিশ্বাস এই যে প্রেতাত্মারা সময়ে সময়ে মানবীয় ব্যাপারে হস্তার্পণ করিয়া থাকে। তাঁহারা প্রেততত্ত্ব নামক স্বতন্ত্র বিদ্যার উদ্‌ভাবন করিয়াছেন। যত দিন না তাঁহাদিগকে নিরুত্তর করা যায়, ততদিন আপত্তিকারিদিগের উক্ত আপত্তি সম্যক ফলোপধায়ী হইতেছে না।

দ্বিতীয়তঃ, ভূতে বিশ্বাস অপরিহার্য্য নহে। স্থান বা অবস্থা বিশেষে অবিশ্বাসকারিদিগেরও মনে ভূতের ভয়ের উদ্রেক হয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইল না যে, ভূতে বিশ্বাস অত্যজ্য অর্থাৎ অবশ্য-বিশ্বসনীয়। আদিম বিশ্বাস সকল এই জন্য অত্যজ্য যে, তাহাদের আশ্রয় ব্যতীত আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস-সমষ্টি দাঁড়াইবার স্থান পায় না—সন্দেহের আঘাতে আমূলত অস্থির হইয়া উঠে। প্রত্যুত আমাদের মনন-ক্রিয়ার এই সকল আশ্রয় একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু ভূতে বিশ্বাস সেরূপ প্রয়োজনীয় নহে। উহা মূল বিশ্বাস নহে। ইহা সে জাতীয় বিশ্বাস নহে, যাহা আত্মার সাক্ষাৎ সমীক্ষণের ফল। ইহা ভয়-জনিত-ক্ষীণ-যুক্তি মূলক বিশ্বাস। আত্মার অমরত্বরূপ মূল বিশ্বাস বিশেষের প্রসূত বলিয়া উহা প্রায় বিশ্বজনীন হইয়াছে। উহার অলীকতা সপ্রমাণ হইলে উহা দুস্ত্যজ্য হয় না। কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয় সকল দুস্ত্যজ্য।

ক্রমশঃ

বৈদিক ঋষিদিগের ধর্ম্মভাব।

আর্য্যসমাজ চিরকালই ধর্ম্মপ্রবণ। বৈদিক কালে ঋষিদিগের চিত্ত স্বভাবতই ধর্ম্মপ্রবণ ছিল। ঋষিগণ প্রকৃতির আশ্চর্য্য ঘটনাবলীতে ঐশী শক্তি দেখিতে পাইতেন। তাঁহারা যত দেবগণের স্তব করিয়াছেন, সকলকেই সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকল্যাণকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্য, বরুণ প্রভৃতি বহুসংখ্যক দেবের স্তব করিয়াছেন এবং প্রত্যেক দেবের স্তুতিকালে তাঁহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। ঋগ্বেদে আমরা আর

দেখিতে পাই যে ঋষিগণ যখন কোন দেবতার স্তব করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন তখন সেই দেবতাই তাঁহার মনের একমাত্র অধীশ্বর, তিনি অন্য দেবগণের কথা যেন বিস্মৃত হইয়াছেন এবং সেই দেবতাকেই প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা জগদীশ্বর সর্ব্বশক্তিযুক্ত বিশ্বব্যাপী বিশ্ববেদাঃ বলিয়া স্তব করিতেছেন। ঋগ্বেদে যদ্যপি আমরা বহুসংখ্যক দেবতার স্তুতি ও পূজা দেখিতে পাই, কিন্তু সকল দেবতাকেই এক ঈশ্বরের নামভেদ বেলিয়া বাধ হয়। প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ সূক্তে আমরা স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাই যে "তাহারা তাঁহাকে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি বলিয়া স্তুতি করে; কিন্তু তিনি একমাত্র দিব্য গরুত্মান্। বিপ্রেরা এক অদ্বিতীয় তাঁহাকে অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা ইত্যাদি বহুনামে স্তুতি করে।" আবার প্রথম মণ্ডলের ৮৯সূক্তের দশম ঋকে আমরা দেখিতে পাই যে, সমস্ত জগৎ এক সর্ব্বব্যাপী সৎবস্তুর বিবর্ত্তমাত্র। এস্থলে অদিতিকে এই সর্ব্বব্যাপী পদার্থ বলা হইয়াছে; যথা অদিতি দ্যুলোক, অদিতি অন্তরিক্ষ, অদিতি মাতা, অদিতি পিতা, অদিতি পুত্র, অদিতি সকল দেবতা, অদিতিতে জাত পদার্থ সমূহ, অদিতি জনিষ্যমান পদার্থ সমূহ এবং অদিতি (গন্ধর্ব্ব পিতৃগণ, দেবগণ, অসুর রাক্ষস) পঞ্চজন।' এস্থলে বেদান্ত দর্শনের মত স্ফুট ব্যক্ত হইয়াছে। দশম মণ্ডলে ৮১ এবং ৮২ সূক্তদ্বয়ে বিশ্বকর্ম্মা দেবের গুণকীর্ত্তন আছে। এই দুই ঋকে বিশ্বকর্ম্মাকে সর্ব্বদর্শী সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন বাক্য ও মনের অগোচর বিশ্বনিয়ন্তা বলা হইয়াছে। এই দুইটি সূক্তের প্রথমটির ৪ ঋকে কবি জিজ্ঞাসা করিতেছেন "সে বনই বা কি এবং সে কাষ্ঠই বা কি যাহা হইতে বিশ্বকর্ম্মা জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন? এবং কি পদার্থের উপর অবস্থান করিয়া বিশ্বকর্ম্মা এই জগৎ রচনা করিয়াছেন?" কবি ইহার কোন উত্তর দিতে পারেন নাই কিন্তু তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এই প্রশ্ন উদ্ধৃত করিয়া ব্রাহ্মণকার ইহার উত্তর দিয়াছেন "ব্রহ্মই সে বন এবং ব্রহ্মই সে কাষ্ঠ যাহা হইতে বিশ্বকর্ম্মা জগৎ রচনা করিয়াছেন। ব্রহ্মই সে আধার যাহার উপর অবস্থান পূর্ব্বক তিনি বিশ্বরচনা করিয়াছেন।" এস্থলে বিশ্বকর্ম্মা শব্দে পৌরাণিক বিশ্বকর্ম্মা নহে। অষ্টম মণ্ডলে ৮৭ সূক্তে ইন্দ্রকে বিশ্বকর্ম্মা এবং বিশ্বদেব বলা হইয়াছে। দশম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তে পূর্ব্বোক্ত ভাবের চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে; যথা "সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুই সৎ বা অসৎ ছিল না; আকাশ ছিল না; দ্যুলোক ছিল না। কি আবরণ ছিল? কি আধার ছিল? উহা কি জল? তখন মৃত্যু ছিল না সুতরাং অমরত্বও ছিল না। তখন দিবা রাত্রির প্রভেদ ছিল না। স্বাশ্রিত এক সৎ স্থিরভাবে বিদ্যমান ছিল। এই এক সৎ কি কি পদার্থ সৃষ্টি করিতে হইবে তাহার চিন্তা করিলেন এবং ঐ সকল সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন। তদনন্তর এই জগৎ সৃষ্টি হইল এবং তৎপরে দেবগণ সৃষ্ট হইলেন। কে বলিতে পারে কি রূপে এই সমস্ত উৎপন্ন হইল; কারণ কেহই ইহার তত্ত্ব অবগত নহে।'

এই সূক্তের ভাব কবি পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড-মহিমা চিন্তা করিয়া কবির মন সন্দেহ-দোলা আরোহন করিয়াছিল এবং কবি কি লিখিবেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া উপরিউক্ত অস্ফুটভাবে স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে "ন মৃত্যুরাসীৎ অমৃতং ন তর্হি" তখন মৃত্যু ছিল না, সুতরাং অমরত্ব ছিল না। এই অংশের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। এস্থলে কবি অতিসূক্ষ্ম ন্যায় অবলম্বন করিয়াছিলেন।

মরত্ব থাকিলে তবে ইহার বিপরীত অমরত্ব থাকিবে, মৃত্যু থাকিলে তবে মরত্ব থাকিতে পারে। যদি মৃত্যু থাকে তবেই বলা যায় উনি মর কারণ উহাঁর মৃত্যু আছে এবং উনি অমর কারণ উহার মৃত্যু নাই। যদি মৃত্যুই না থাকিল তবে কে মর এবং কে অমর তাহার বিনিগমনা অসম্ভব হইল। অতএব তখন মৃত্যু ছিল না সুতরাং অমরত্বও ছিল না। শার্ম্মণ্যদেশীয় পণ্ডিত মোক্ষমূলর এই ন্যায়ের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন এবং তদনুসারে অন্যান্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও ইহা লইয়া আন্দোলন করিয়াছেন। এই সূক্ত অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণে ও উপনিষদে ঘোরতর আলোচনা দেখা যায়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেরও উপনিষদে এবং ছান্দোগ্য উপনিষদে এই সূক্ত আশ্রয় করিয়া বিবিধ দার্শনিক মতের সমালোচনা করা হইয়াছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের নবতি সূক্ত বৈদিককালে ধর্ম্মভাবের আর একটি নিদর্শন। এইটির নাম পুরুষ-সূক্ত, ইহাতে পরমপুরুষ স্বশরীর যজ্ঞে সমর্পণ করিয়াছেন। এই সূক্তে যজ্ঞবাহুল্যের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার শেষাংশ অত্যন্ত জটিল এবং দুরূহ বলিয়া আমরা উহার উপর কোন মতামত প্রকাশ করিব না। আমরা প্রথমাংশ হইতে আর্য্যসমাজের ধর্ম্মভাব প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব। "পুরুষ সহস্রশীর্ষবিশিষ্ট, সহস্রচক্ষুবিশিষ্ট এবং সহস্রপাদবিশিষ্ট। পুরুষ বিশ্বভূমণ্ডল ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। এই জগৎ যাহা ভূত, যাহা বর্ত্তমান এবং যাহা ভবিষ্যৎ সমস্তই পুরুষ। পুরুষ অমৃতত্বের ঈশ্বর।" এস্থলে পরব্রহ্মকেই পুরুষ বলা হইয়াছে। পরব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন এবং সর্ব্বজগদীশ্বর বলিয়া সহস্রশীর্ষ বিশিষ্ট; সর্ব্বজ্ঞ এবং বিশ্ববেদা বলিয়া সহস্রচক্ষুবিশিষ্ট এবং সর্ব্বজগদ্ব্যাপী ও সর্ব্বভূতগত বলিয়া সহস্রপাদবিশিষ্ট। সমস্ত ভূত, বর্ত্তমান এবং ভব্য জগতই পুরুষের রূপভেদ মাত্র। পুরুষ নিত্য, অমৃতানন্দময়। একব্রহ্মের অর্চ্চনাই বৈদিক ঋষিদিগের ধর্ম্মের মুখ্য ভাব। যদিও ঋষিরা ইন্দ্র প্রভৃতি বহুসংখ্যক দেবগণের পূজা করিয়াছেন কিন্তু সকলকেই এক সৎ ব্রহ্মের ভেদ বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অথর্ব্ববেদেও এই পুরুষসূক্তের অবিকল প্রতিকৃতি একটি সূক্ত আছে। ইহার ভাবও ঋগ্বেদের সূক্তের ন্যায় অস্ফুট। শতপথ ব্রাহ্মণে পুরুষকে নারায়ণ বলা হইয়াছে এবং লিখিত আছে যে পুরুষ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্ববিশ্বময় হইতে কামনা করিয়া সর্ব্বমেধ যজ্ঞ করেন। সর্ব্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা তিনি সর্ব্বাতিগ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী হইয়াছেন। অথর্ব্ববেদে স্কম্ভ সূক্ত নামে এক সূক্তে পুরুষের অচিন্ত্য অব্যক্ত মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক,তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, এবং অথর্ব্ববেদে এতদ্বিষয়ক বিস্তর আন্দোলন আছে, কিন্তু তৎসমুদায়ের সার মর্ম্ম উপরি যাহা প্রকটিত হইয়াছে তদধিক নহে।

নিরুক্তকার যাস্ক একস্থলে বলিয়াছেন যে যদ্রূপ এক ব্যক্তি কর্ম্মভেদে হোতা উদ্গাতা, ব্রহ্মা, অধ্বর্যু ইত্যাদি বহুবিধ আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন, তদ্রূপ এক ব্রহ্ম স্বীয় মহিমা এবং কার্য্য বৈচিত্র বশত বহুবিধ দেবে পরিণত হইয়াছেন। উপাসকেরা যখন যেভাবে তাঁহার স্তব করিয়াছেন তখন তাঁহাকে তদুপযোগি নামে আখ্যাত করিয়াছেন। এইরূপে তাঁহার অসংখ্য নাম উদ্ভূত হইয়াছে। এবিষয়ে একটি ঋক প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে; যথা

'ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্যদ্ যুষ্মাকমন্তরং বভূব।
নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যাশ্চাসুতৃপ উক্থশাসশ্চরন্তি॥

হে মনুষ্যগণ তোমরা তাঁহাকে জানিলে

না, যিনি এই বিশ্বভুবন উৎপাদন করিয়াছেন এবং যিনি তোমাদের সকলের অতিরিক্ত হইয়া তোমাদিগের অন্তরে রহিয়াছেন, তোমরা তাঁহাকে জানিলে না, যদিও তিনি তোমাদিগের শরীরের মধ্যে আত্মার অভ্যন্তরে স্থিতি করিতেছেন। ইহার কারণ এই যে তোমরা অজ্ঞানরূপ নীহারে আচ্ছন্ন রহিয়াছ, বৃথা জল্পনাতেই সময় নষ্ট করিতেছ, ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখে মোহিত এবং পরিতৃপ্ত হইতেছ এবং বাহ্য যাগাদির আড়ম্বরেই সময় অতিবাহিত করিতেছ। তোমরা সেই বিশ্বস্রজক বিশ্বনিয়ামক, বিশ্বব্যাপক পুরুষকে জানিতে চেষ্টা করিলে না, জ্ঞান অর্জ্জন করিতে চাহিলে না, ইন্দ্রিয়-সুখকে ধর্ম্মের অনুগত করিলে না এবং একাগ্রচিত্তে তাঁহার উপাসনায় রত হইলে না। অতএব তোমরা তাঁহাকে জানিতে পারিলে না।” উপরি যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা দ্বারা বৈদিক সময়ে ঋষিদিগের ধর্ম্মভাব এক প্রকার বোধগম্য হইবে। আর্য্যসমাজ ক্রমশঃ যত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই আর্য্যসমাজের ধর্ম্মভাব বিকসিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। উপনিষদে এই ধর্ম্মভাবের পরাকাষ্ঠা, উপনিষদে এই ধর্ম্মভাব সম্বর্দ্ধিত, এবং সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত। এস্থলে অধুনাতন বঙ্গসমাজে ধর্ম্মভাব বিষয়ে দুই এক কথা বলা অসঙ্গত হইবে না। অধুনা বঙ্গদেশে নাস্তিকতার প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। সমাজের নিমিত্ত যে কোন একটি বন্ধন আবশ্যক তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। মনুষ্যের চিত্ত পাপের দিকে স্বভাবতঃ প্রবণ। সাধারণকে সৎপথে চালিত করিবার জন্য উত্তেজনা চাই, শাসন চাই। আমরা কার্য্য করিবার পূর্ব্বে তাহার ফলাফল গণনা করিয়া সেই কার্য্য করি না। আমাদিগের কার্য্যকারী মানসিক বৃত্তি সমূহ অন্ধ ও চিন্তাশূন্য। এই বৃত্তি সমূহ যদি সৎপথে চালিত না হয় তবেই সমাজের অনিষ্ট ঘটে। এই বৃত্তি সমূহকে সৎপথে চালন করিবার নিমিত্ত একটি শাসন আবশ্যক। ইহা রাজবিধি দ্বারা সাধিত হইতে পারে না, যেহেতু রাজবিধির কার্য্যকারিতা নিবৃত্তির দিকে অতি সংকীর্ণভাবে প্রসৃত। ইহা সাধারণ মতের দ্বারা সাধিত হয় না, যেহেতু সাধারণ মত বাহ্য শক্তি, সাধারণ মতের শাসন কেবল কার্য্যের উপর, মনের উপর নহে। মনের পাপেচ্ছা সাধারণ মতের অধিকারায়ত্ত নহে, ইহা কেবল মনের পাপেচ্ছা পাপে পরিণত হইলে তাহা সংশোধন করিতে পারে। অতএব রাজবিধি কিম্বা সাধারণ মতের দ্বারা সমাজশাসন হইতে পারে না। সুতরাং ধর্ম্মভাবের প্রয়োজন; ধর্ম্মভাবই কেবল উপরি উক্ত বৃত্তিসমূহকে সৎপথে চালিত করিতে পারে এবং সমাজকে পাপের দিক হইতে ফিরাইতে পারে। ধর্ম্মভাব আভ্যন্তরীণ শক্তি। ইহা মানসসংশোধনে বিশেষ পটু। মনের অগোচর পাপ নাই—মনে যে কোন পাপেচ্ছার উদয় হইবে ধর্ম্মভাব তাহা নিবারণ করিতে একমাত্র সক্ষম। ধর্ম্মভাবের দ্বারা পাপ হইতে বিরতি, সৎপথে রতি, উচ্চতর প্রবৃত্তি সকলের উন্নতি প্রভৃতি সাধিত হয়! ধর্ম্মভাব সমাজের হিতকর, মঙ্গলময় যথার্থ জ্ঞান ধর্ম্মভাবের পরিপোষক, বিজ্ঞান ধর্ম্মভাবের পরিবর্দ্ধক, সুতরাং জ্ঞানের উন্নতিতে ধর্ম্মভাবের লোপ হয় না। জ্ঞান কোন কালেই সীমার অন্তর্ব্বদ্ধ হইবে না, কারণ জ্ঞান বৃদ্ধিশীল এবং তজ্জন্য চিন্তা, অনুসন্ধান আবশ্যক। এই অনুসন্ধান ধর্ম্মভাবের প্রতিকূল নহে। ধর্ম্মভাব সমাজ হইতে লুপ্ত হইলে সমাজ দুর্ব্বল, জরাজীর্ণ, নির্জীব ও প্রাণহীন হইয়া পড়িবে। বঙ্গ সমাজে অধুনা এই পরম হিতকর ধর্ম্মভাবের অপচয় ও লোপ

করিবার আশা ও ইচ্ছা বলবতী দৃষ্ট হয়। ইহা সমাজের পক্ষে বিশেষ শোচনীয়। অধুনাতন বঙ্গসমাজে শিক্ষিত বিভাগের অধিকাংশই হয় ধর্ম্মে উদাসীন না হয় নাস্তিক। ইহাঁরা কেবল হিন্দুধর্ম্মে অনাস্থা দেখাইয়া, হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ক্ষান্ত নহেন; কিন্তু ইহাঁরা ধর্ম্মভাব নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছেন। সমাজ মধ্যে এতাদৃশ ধর্ম্মভাবের অপচয় দেখিলে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হই। ইহা সমাজের মঙ্গলকর নহে। ধর্ম্ম বিষয়ে লোকের যে মত হউক না কেন, ধর্ম্মভাবের উপকারিতা সকলের স্বীকার করা উচিত। ধর্ম্মভাব সমাজের একান্ত প্রয়োজনীয়। ধর্ম্মভাবের অপচয় হইলেই, নীতির অপচয় হয় এবং তাহাই সামাজিক অমঙ্গল। ঈশ্বরের নিকট একান্তচিত্তে আমরা প্রার্থনা করি যে বঙ্গবাসীগণ ধর্ম্মভাবের কার্য্যকারিতা, উপযোগিতা এবং সমাজ সম্বন্ধে উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বঙ্গসমাজ হইতে ধর্ম্মভাব উড়াইয়া দিতে চেষ্টা না করেন। ধর্ম্মভাব বঙ্গসমাজ অব্যাহত রাখিবার একমাত্র উপায়।

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান। শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেনগুপ্ত কবিরাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রথম খণ্ড। সূত্রস্থান। কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ যন্ত্র। ১৮০০ শক। মূল্য ৪ চারি টাকা মাত্র।

ইহা কোন গ্রন্থ বিশেষের অনুবাদ নহে। ইহাতে প্রাচীনতম আয়ুর্ব্বেদীয় চরক, শুশ্রুত, আত্রেয় সংহিতা, হারীত, বাগ্‌ভট, রসেন্দ্র চিন্তামণি, রসরত্নাকর ও ভাবপ্রকাশাদি বিবিধ গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত মূল সঙ্কলিত হইয়া তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহ অন্যান্য পরিজ্ঞেয় তত্ত্ব সকল যথাযোগ্য পদ্ধতি ক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে। গ্রন্থাগর্ত প্রধান প্রধান বিষয়ের নিম্নে লিখিত সংক্ষেপ বিবরণ দ্বারা পাঠকবৃন্দ গ্রন্থের প্রকৃতি অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারিবেন।

(১) আয়ুর্ব্বেদ লক্ষণ
(২) আত্রেয়, চরক, সুশ্রুত, চক্রপানি এবং ভাব মিশ্রের গ্রন্থ প্রচার।
(৩) শল্য তন্ত্র লক্ষণ (অস্ত্র চিকিৎসা)
(৪) দ্রব্যের উপযুক্ততা ও অনুপযুক্ততা
(৫) তৈল মূর্চ্ছা বিধি
(৬) স্নেহ পাক
(৭) অরিষ্ট বিধি
(৮) কাদম্বরী, বারুণী প্রভৃতি সুরার লক্ষণ
(৯) বমন বিধি
(১০) বিরেচন বিধি
(১১) বস্তি কর্ম্ম (পিচকিরি দেওয়া)
(১২) স্বেদক্রিয়া
(১৩) রক্তমোক্ষণ নিয়ম
(১৪) লবণ, অম্ল, মধুর, কটু, তিক্ত কষায়, যড় রসের গুণ
(১৫) দিন চর্য্যা
(১৬) রাত্রি চর্য্যা
(১৭) ঋতু চর্য্যা
(১৮) ব্যায়ামের বিধি
(১৯) ভোজনাদি বিধি
(২০) বয়োবিভাগ
(২১) চিকিৎসা বিধি
(২২) চিকিৎসকের লক্ষণ
(২৩) নাড়ী পরীক্ষা
(২৪) জিহ্বা পরীক্ষা ও মূত্র পরীক্ষা
(২৫) সর্পাস্য, কুঠারী করপত্র প্রভৃতি যন্ত্রের বিবরণ
(২৬) স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতুর সংখ্যা ও নিরুক্তি।

এই গ্রন্থের বিষয় সকল যেরূপ গুরুতর, লিখন-প্রণালী তেমনই প্রাঞ্জল এবং মুদ্রাঙ্কন

কার্য্যও সেইরূপ সুন্দররূপে নিষ্পাদিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে আর্য্য ঋষিদিগের চিকিৎসা বিদ্যার যে কি অসামান্য নৈপুণ্য ছিল, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইংরাজি চিকিৎসা বিদ্যায় যে অস্ত্র চিকিৎসা এখন মহা গৌরবের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে, ভারতে বহু শতাব্দীকাল পূর্ব্বে সেই অস্ত্র-বিজ্ঞানের মহোন্নতি হইয়াছিল। গ্রন্থে যে সকল আয়ুর্ব্বেদ-প্রতিপাদিত অস্ত্রের চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা অনেকগুলি দেখিতে ইংরাজি অস্ত্রের ন্যায়। নর-দেহ-পরীক্ষা ও শবচ্ছেদ পূর্ব্বক তাহার অভ্যন্তরিক স্নায়ু শিরা পেশী অস্থি উপাস্থি এবং রক্তাধার,হৃৎপিণ্ড, প্লীহা, যকৃৎ, পাকাশয়, মুত্রাশয় প্রভৃতি যন্ত্রজ্ঞান ও তাহারদিগের প্রকৃতি ও কার্য্য-পদ্ধতি অবগত হওয়াই যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভিত্তিভূমি; আর্য্য-চিকিৎসা-বিজ্ঞানবিৎ মহর্ষিগণ তাহা সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়া বলিয়া গিয়াছেন যে শস্ত্র-চিকিৎসা চিকিৎসক মাত্রেরই অবশ্য পরিজ্ঞেয়। যাঁহারা তাহা না জানেন, তাঁহারা কুবৈদ্য শব্দের বাচ্য।

ছেদ্যাদিষ্বনভিজ্ঞো যঃ স্নেহাদিষু চ কর্ম্মসু।
স নিহন্তি জনং লোভাৎ কুবৈদ্যোনৃপদোষতঃ॥

উপর্য্যুপরি ভারত-রাজ্য কয়েক শতাব্দী কাল বিজাতীয় শাসনাধীনে অবস্থান করাতে আর্য্য জাতির সংস্কৃত সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতির যেমন অধোগতি হইয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ প্রাণদ আয়ুর্ব্বেদও লুপ্ত প্রায় হইয়াছিল। ঈশ্বর-প্রসাদে নানাকারণে এখন যে ভারত সন্তানগণের সেই জগৎ-পূজ্য পূর্ব্বপিতৃপিতামহদিগের কাল-প্রোথিত অক্ষয় কীর্ত্তিকলাপ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে, এটী আর্য্যসমাজের একটী মহা মঙ্গল চিহ্ন বলিতে হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

ভারতের আয়ুর্ব্বেদ যে পৃথিবীর বহুতর জাতির চিকিৎসা-শাস্ত্রের একমাত্র জনক জননী, তাহা পুরাবৃত্ত-তত্ত্বানুসন্ধায়ী মহাপুরুষগণ নিঃসংশয়ে অবধারণ করিয়াছেন। পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতদিগের দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে আরবেরা আমাদিগের চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে অনেক লইয়াছে এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতে ইউরোপীয়েরা লইয়াছে। অন্য জাতি এ বিষয়ে আমাদিগের নিকট ঋণী কিন্তু আমরা বিজাতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া মুশলমান রাজত্বের সময় হাকিমি, ইংরাজ অধিকারে ইয়ুরোপীয় চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়া এমনই দেখাইতেছি যে ভারত ভূমিতে বৈজাতিক চিকিৎসার শুভাগমন না হইলে যেন ভারতবর্ষ জন-শূন্য হইয়া পড়িত। আমরা কেবল জড়ের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া দিন দিন অধিকতর রূপে ইউরোপীয়দেরই মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতেছি। আমরা না জানিয়া শুনিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়া থাকি যে আমাদের শারীর বিদ্যা ছিল না, কিন্তু ভিন্ন দেশীয় অনেকানেক সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বিশেষতঃ সুবিখ্যাত ডাক্তার ওয়াইজ সাহেব মহোদয় তাঁহার "হিন্দু সিস্টেম্ অব্ মেডিসিন" নামক গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন যে রীতিমত শবচ্ছেদ করিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় শারীর স্থান লিখিত হইয়াছে*। শারীর বিদ্যা না থাকিলে প্লীহা, যকৃৎ, কণ্ঠনালী, হৃৎপিণ্ড, পাকাশয়, মুত্রাশয় প্রভৃতি যন্ত্ররোগ-বিশিষ্ট সমুদায় চিকিৎসক-পরিত্যক্ত কঙ্কাল-অবশিষ্ট বহুতর রোগীগণ যে কেমন করিয়া বৈদ্যচিকিৎসায় সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া থাকেন, তাহা একবারও চিন্তা করি না। আর্য্যঋষি-

* Commentary on the Hindu system of Medicine. By T. A. Wise M. D. New Issue, London 1860, page XVI.

দিগের যন্ত্রজ্ঞান না থাকিলে তাঁহারা কদাচ যান্ত্রিকরোগের অব্যর্থ ঔষধ সকল উদ্‌ভাবন ও আবিষ্কার করিতে পারিতেন না। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের এই অবনতির অবস্থাতেও যদি কিছু তাহার গৌরব ও মহত্ত্ব থাকে তবে কাশ, যক্ষ্মা,রক্তাতিসার, বহুমূত্র প্রভৃতি যান্ত্রিক রোগেরই চিকিৎসা জন্য। বর্ত্তমান আর্য্য চিকিৎসকদিগের মধ্যে শস্ত্র-বিজ্ঞান অধ্যয়ন ও আলোচনা এবং শব-চ্ছেদ শিক্ষা না হওয়া একটী দোষের কারণ। বিনোদ বাবুর বিজ্ঞতা পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং অর্থ ব্যয় দ্বারা ক্রমে আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের অভাব পূরণ হইতে চলিল। আমরা উপর্য্যুপরি তাঁহার নিকট হইতে উচ্চতর উপহারই প্রাপ্ত হইতেছি। ঈশ্বর-প্রসাদে তাঁহার সাধু কামনা সংসিদ্ধ হয়, এই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা। এই গুরুতর বিষয়ে —এই জাতিগত গৌরব সম্পাদনে দেশহিতৈষী ধনাঢ্য জনগণ একটু উৎসাহ দানে অগ্রসর হইলে আর্য্য ঋষিদিগের একটী অক্ষয় কীর্ত্তির পুনরুদ্ধার হয়; তাহাতে ভারতের স্বাস্থ্যসম্পদ, সৌভাগ্যসমৃদ্ধি পুনরভ্যুদিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

EXTRACT.

(STATESMAN, Nov 5, 1878.)

IT is impossible of course to suppose that so obvious a reflection has not occurred to a multitude of minds, but it is still the fact that we have never yet seen the consideration pressed so strongly as it might be, upon the scientific school of which Darwin, Huxley, and Clifford are the great apostles, that the theory which excludes a Personal God from the universe necessarily makes man himself—God. By a Personal God we mean simply a Supreme Will and Intelligence in Nature, which Will and Intelligence are declared by a process of reasoning to have no *necessary* existence, while the gulf is then boldly leaped to the assertion that they *have* no existence. This conclusion is wrought out with great ability and in the most uncompromising form in an article on *Theism* that appeared in the *Westminster Review* of October,1875, in which the writer joins issue with the central thought of Paley's *Natural Philosophy,* that evidence of design proves the antecedent existence of a designer. The line of argument taken is that what Paley, and the world at all times have been accustomed to regard as evidences of design in Nature, prove nothing of the kind. The writer of the essay, which is an extremely able one, is careful not to shock the reader by summarily assuring us that every material phenomenon that exists is the product 'of a fortuitous concourse of atoms,' but such is the conclusion to which he leads up by a process of ingenious and subtle reasoning, the hollowness and general fallacy of which are *felt* with more certainty than they are intellectually discerned. We lay down the *Review* with very mnch the same feelings with which we rise from a perusal of Edwards on the *Freedom af the Will.* Though unable to detect any flaw in the reasoning, we feel that the writer has landed himself and us in conclusions which our consciousness repudiates as untrue. The conclusion is felt to be irreconcilable with that 'by which alone we discern that two and two make four. We cannot *prove* that two and two do not make three or five: we simply *discern* that they do not, and the belief that they do not rests upon what is sometimes called 'the universal postulate.' The highest assurance we can attain to on any subject, rests upon the assumption that 'what our consciousness tells us *is* and *must* be true, is true. With a process of reasoning, therefore, like that employed by Edwards to establish that no such thing as freedom of the will is possible, we have to make our election between what is declared to be *true,* on the strength of a chain of a reasoning, or what our consciousness, in opposition thereto, declares to be so. As a fact, no man yet succeeded in divesting himself of the consciousness that there is a self-determining power in his nature, however great the mystery of its existence, or however much opposed to the conclusions of a course of reasoning on the subject.

In the same way, we do not believe that

the human mind exists that is really able to accept it as a fact, as the very truth of things, that the eye, with its wondrous mechanism of adaptations to the condition of things around it, is really but "a fortuitous concourse of atoms." We may by a series of assumptions and chain of reasoning, construct for ourselves a mental telescope through which the only Universe we are able to discern is a nebulous diffusion of gases, or a fortuitous assemblage of atoms, and then boldly leap to the conclusion that, as a fact, this *is* the Universe, that neither Intelligence nor Will ever had place in the Infinities, or the Eternities, around us; but the human mind is so constituted that by no effort can it leap this gulf to firm footing on the other side. The human consciousness—the ultimate court of appeal in the case—is so overwhelmed by the evidences of Power guided by Intelligence that crowd upon its observation, that it rejects with impatience, and ever must so reject, wire-drawn reasonings on the subject that have to be rendered by an instrument so notoriously feeble and misleading as human language. The fallacies suggested by a long verbal puzzle are pressed upon our acceptance as the facts of things, in opposition to the strongest evidence which our nature admits of our recording in the case. The question between the Materialist school and ourselves resolves itself into their demand that we should accept conclusions as to the Universe, that the human 'consciousness' rejects as impossible, and that, in boldly denying the existence of a Personal God in the Universe, positively require us to declare that we believe Man to be himself—God; or at all events the only Being in the Universe who, so far as we know, is possessed of these two mysterious and *preter*-natural powers of Will and Intelligence.

And the reflection which surprises us is that we have never seen this consideration sufficiently pressed upon the school which tells us with such amazing confidence that there is neither Will nor Intelligence in the Universe outside man himself, or creatures that have been produced in the same way. We are asked to accept it as a *fact*, be it remembered, and not as a mere speculation, that the Will and Intelligence, the existence of which it is not possible to deny in man, are the 'fortuitous' outcome of the diffused nebulous gases or concourse of atoms, that are declared, as a *fact*, to be the Universe in its original form. The flower with its exquisite beauties, the mind with its subtle powers, are the fortuitous outcome of a dead, inorganic Universe of atoms diffused as gases throughout space, and in which these extraordinary powers of evolution necessarily, though unconsciously, reside. By the hypothesis, it is an accident only that the Universe of order and beauty and mystery has been evolved therefrom, with Will and Intelligence crowning the wondrous edifice that *chance* has begotten. Now we say that such a conclusion is impossible to a well-ordered and unbiassed mind. The human mind is so constituted that it rejects, and ever must reject, such a belief, however ingeniously it may be pressed upon it by reasoning. We are more sure that the reasoning is false, than that such a conclusion is true. It is simply impossible for man to believe what this school on the strength of their feeble observations, research, and reasoning present to him as their theory of the Universe. The same consciousness that makes us sure that two and two are not five but four, tells us that the theory must be false: and that the world of beauty and design in which we find that mystery, the conscious *ego*, was never produced in *this* way. We are in the midst of a world existing under conditions of design and adaptation that overwhelm the mind with astonishment, admiration and awe. It is useless to enter upon any wire-drawn argument, with the feeble instrument of human language, to persuade us that what we deem 'design' and 'adaptation' need not necessarily be so. The well-ordered mind, reflecting on the feebleness of the 'powers' engaged in this inquiry—that they are bounded by the five dull senses of the creature that presumes so vast a flight upon their observations—and that for anything we know or can presume to the contrary, there may be creatures endowed with fifty senses instead of five revealing to them a thousand Universes beyond that which man discerns in the same cosmic order—will ever reject with something of contemptuous indignation the assurance of the fool that "there is no God." Let not this language be deemed to strong; for we have this con-

clusion boldly, and impiously pressed upon us, without any 'circumlocution' whatever, in the writings of Professor Draper and others of the school. Casting their material 'observations' to the winds, treating them in fact with the same contempt which they shew for the study of mental and emotional phenomena, just as *real* as their material facts—for we are in this predicament, that both must be regarded as real or neither—we ask these five-sensed, creeping, feeble things, how they have come to *know* there is no God? For it is easy to shew, as Mr. Foster in his *Essays* long since pointed out, that the assertion, as a fact, *that there is no God,* implies that the being who makes it is himself God. The reader will observe that it is not as a 'speculation' that this conclusion is being pressed upon the world to-day by the whole Materialistic school, but as a 'fact.' We are told by the Professor, for instance, that it is as certain 'there is no God,' as that two and two make four. The Professor *knows* the fact, and is impatient that any one should question it. Now look at this five-sensed Professor steadily for a moment or two. He is an almost infinitesimally small creature in this universe upon the nature and origin of which he dogmatises. *All* that he knows of it is what his five feeble senses have observed, and what that "infinitely little" instrument, human language, has taught him. He knows nothing more whatever. He has seen a little, smelt, tasted, heard, and felt a little an atomic little, and that is the whole range of what he calls his personal knowledge. Confessedly, the five instruments of his knowledge are so feeble and dull, that what he 'sees' is no more than what his eye, assisted it may be by microscope and telescope, enable him to see. And then it is allowed that after all, he does not 'see' the very thing itself, but the picture of it that the mechanism of his eye frames for his brain. He has never in fact really 'seen' anything to this hour, and knows it just as well as we do. Beyond the infinitely small 'personal' knowledge thus gained by him, he has by the use of that most feeble and unsatisfactory instrument we call 'language,' reflected and reasoned upon this 'personal knowledge,' and the personal knowledge of other men communicated to him by so imperfect an instrument that he never can be sure he really grasps the idea as it exists in other minds. So imperfect and partial is the knowledge that he possesses that he is astonished to learn in the midst of his 'certainties,' that the possibility of a space of *four* dimensions is drawing upon the minds of his mathematical compeers, while for anything he or they *know* to the contrary, space of twenty dimensions may exist as well as of *four* and twenty senses as well as his poor feeble *five.* And this miserably feeble creature, on the strength of his knowledge, dares lift up his voice to the Universe—of which he *knows* literally nothing whatever—and boldly tells it that he knows *all*: in particular, he knows that "*there is no God.*" Is it not clear as the noon-day that unless Man is himself God, in other words unless he has himself measured the Infinities, lived through the Eternities, and exhausted the facts of the Universe—he cannot *know* that 'there is no God?' How easily is it conceivable that the addition of a sixth sense to his powers, might present to even him, the overwhelming proof and consciousness of that which he now so impiously and wildly denies! We need not pursue the train of thought. It is to ourselves amazing that men of this school should make the daring flights they do upon the strength of the feeble powers of man. No truly philosophic mind can regard their attitude but with astonishment. The contempt which the school expresses for the study of mental phenomena, has probably reached its present insane development under the influence of the Positive Philosophy. Comte discredited metaphysical and moral studies, on the ground that they dealt with the 'unknowable,' while these materialistic philosophers have leaped the gulf to a bold declaration that the 'unknowable' has no existence. That an emotion of pity, awe, or reverence passing though the mind, is as real a phenomenon as the passage of an electric current through a wire seems never to enter the minds of these philosophers. The one is as *real* as the other, and the Positivist attempt to exclude Mental and Moral phenomena from the curriculum of human studies has been developed by the Materialistic school into a virtual denial of Intellectual and Moral phenomena altogether. They are idly dismissed as a mere product of the 'orga-

nism' with which they are associated, while their extreme subtlety is made an excuse for neglecting their observation as being essentially 'unknownable.'

And yet it is *here* that the human consciousness instinctively finds God. One-half, and by for the greater half, of our conscious being is thus deliberately excluded from the sphere of human research by the Positivists, on the ground that it is a region of the unknown where the human race in its infancy and early manhood loved to expatiate, but that should be avoided in its mature life for the realms of Positive knowledge. With the Materialistic school the 'unknowable' becomes the 'non-existent,' the gulf between the two being boldly leaped, and all study of the Intellectual and Moral nature of man treated as though it dealt with unrealities. There is reason, we think, to fear that this school is influencing the public life of England very disastrously. The idea of righteousness, of purity, of duty, necessarily disappears with such systems of philosophy in the ascendant. "The fool hath said in his heart, there is no God." and lives accordingly. It is impossible not to see how largely the London press practically reflects this unhappy delusion. "Greed of material gain, fear of material loss," are openly proclaimed to us as the principles upon which our conduct towards other nations should be regulated, while the Divorce Court becomes the staple of one-half the literature society provides for itself. In trying to banish God from amongst us, human goodness is being driven out therewith, as in all ages before, and in all places where the experiment has been tried. Happily it can never succeed but partially in the world. It may end in degrading England from her ascendency amongst the nations; when other people will take her place in the world, with the pillar and cloud of the Divine presence accompanying them, on the great mission to which England has been unfaithful and apostate.

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১১ মাঘ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে ১১।১২।১৩ মাঘে আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক সকল নিম্নলিখিত নগদ মূল্যে বিক্রয় হইবে।

মফস্বলের ক্রেতাগণ ১১ মাঘের মধ্যে মণিঅর্ডার বা হুণ্ডি দ্বারা পুস্তকের মূল্য ও আনুমানিক ডাক মাশুল পাঠাইলেই পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন, ডাকের টিকিট পাঠাইবেন না।

নির্দ্ধারিত মূল্য।

ব্রহ্ম বিদ্যালয় ...	১
বেদান্ত প্রবেশ	১
স্মৃতি	১
বক্তৃতা কুসুমাঞ্জলি ...	১
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে?	।০
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায়	৶০
গীতাঙ্কুর	।০
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ ভাল বাঁধা ...	॥০
রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী ১ম হইতে ১০ম সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রতি সংখ্যা	॥০
A Discourse aginst Hero making in religion As	12
Science of Religins	4

---

২৫ টাকা কমিসন বাদে নির্দ্ধারিত মূল্য।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে)	১॥৴
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (ঐ ভাল বাঁধা)	১৸৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	২॥৵০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ...	।৵০
ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ	।৵০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা প্রথম ভাগ	।৵০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	॥/০
হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ...	।৵০
পৌত্তলিক প্রবোধ ...	৶০
গৃহকর্ম্ম	৶০

	As.	P.
Defence of Brahmoism and of Brahma Samaj	8	
Brahmic Questions of the Day p		6
Brahmic Advice, Caution and Help	2	3
Adi Brahma Samaj its Views and Principles	1	5
Adi Brahma Samaj is a Church	2	3
A Reply to the Query: What is Brahmoism	3	
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	0	9
Reply to Bishop Watson's Apology for the Bible	4	6

নির্দ্ধারিত অর্দ্ধ মূল্য।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ	।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—দ্বিতীয় প্রকরণ	।০
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ	।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক ভাব	৵০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম ...	৶০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বিতীয় খণ্ড ...	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম তাৎপর্য্য সহিত	।০
মাঘোৎসব	॥০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ...	৶০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ...	৶০
কাশীশ্বর মিত্রের বক্তৃতা ...	।০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ...	৶০
ভবানীপুর সাংবৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	(১০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ	॥০
তত্ত্ববিদ্যা দ্বিতীয় সংস্করণ ...	৸০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা প্রথম ভাগ ...	॥০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা দ্বিতীয় ভাগ ...	॥০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে	১
অধিকারতত্ত্ব	।০
হিন্দুধর্ম্মনীতি	॥০
ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা	।১০
তত্ত্বপ্রকাশ	।১০
ধর্ম্মতত্ত্বালোচনা	।১৫
ব্রহ্মোপাসনা	(১০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	(১০
ব্রহ্ম স্তোত্র	(১৫
ধর্ম্ম-শিক্ষা	।০
প্রবচন সংগ্রহ ...	(১৫
ব্রহ্ম-সঙ্গীত চতুর্থ ভাগ ...	।০
ব্রহ্ম-সঙ্গীত পঞ্চম ভাগ ...	।০
সঙ্গীত মুক্তাবলি ১।২ ভাগ একত্রে	৶০
সঙ্গীত মুক্তাবলি তৃতীয় ভাগ ..	৶০
কুমার শিক্ষা	৶০
প্রশ্নমঞ্জরী	।০
প্রভাত-কুসুম	৶১০
উদ্বোধনাঞ্জলি	(১০
ধর্ম্ম দীক্ষা	(১০
ব্রহ্মসাধন	।০
ব্রহ্মজ্ঞান	(১০
ব্রহ্মজ্ঞান সূত্র তাৎপর্য্য সহিত ...	।১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব প্রথম খণ্ড ...	(১৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব দ্বিতীয় খণ্ড ...	।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত জন সমাজের সম্বন্ধ	(১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক প্রস্তাব	(১০
উপদেশ	(৫
দুর্গোৎসব	(১০
পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	(১০
বর্ণমালা প্রথম সংখ্যা ...	(৫
বর্ণমালা দ্বিতীয় সংখ্যা ...	(১০

	Rs.	As,	P.
Ontology	1		
Hindoo Theism			6
Theist's Prayer Bock ...			6
Siens of the Times ...			6
Vedantic Doctrines Vindicated	I		
Docitrine of Christian Resurrection	1		
Physiology of Idolatry	I		
Miracles or the Weak Points of Revealed Religion	4		

নির্দ্ধারিত সিকি মূল্য।

দশোপদেশ	৶১০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত) ...	।০
অনুষ্ঠান পদ্ধতি	৶০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	(১০

১৭৭০ শক অবধি ১৭৯৮ শক পর্য্যন্ত (১৭৭৪ ও ১৭৮১ শক বাদে) যে সকল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পুস্তকালয়ে উপস্থিত আছে, তৎসমুদায়ও অর্দ্ধমূল্যে অর্থাৎ প্রতি বৎসরের একত্র বাঁধান ২॥০ টাকার হিসাবে বিক্রয় হইবে।

নির্দ্ধারিত মূল্যের পুস্তক সকল অন্যূন দশ টাকার ক্রয় করিলে শতকরা ১২॥০ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া হইবে।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৭ মাঘ রবিবার দুই প্রহর তিন ঘণ্টার সময় আমাদিগের যোড়াসাঁকোস্থ ভবনে ব্রাহ্মসমাজ-সংস্থাপক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা হইবে, এবং এই উপলক্ষে তথায় উক্ত মহাত্মার রচিত কতিপয় গান গীত হইবেক। অতএব ব্রাহ্মদিগের প্রতি সবিনয় নিবেদন যে তাঁহারা উক্ত সভাতে আগমন করিয়া ঐ কার্য্য সুসম্পাদন করিবেন।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

SCIENCE OF RELIGION
BY
RAJNARAIN BOSE.

To be had at the Adi Brahmo Samaj and Canning Libraries. Price 4 annas. Postage ½ anna.

POLITICAL LIBERTY AND THE BEST MEANS FOR ITS ATTAINMENT BY THE NATIVES OF INDIA BY A HINDU YOUTH NOW RESIDING IN EUROPE.

Distributed gratis from the Adi Brahmo Samaj Library. Mofussil applicants for the pamphlet are required to remit a half anna postage stamp.

সম্বৎ ১৯৩৫। কলিগতাব্দ ৪৯৮০। ১ পৌষ রবিবার।

Registerd No 52.

নবম কল্প
চতুর্থ ভাগ
৪২৬ সংখ্যা। মাঘ ১৮০০ শক। ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৯

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

" উত্তিষ্ঠত। "

মনুষ্য উত্থানবান্ জীব। অন্য জীব উত্থানাবস্থায় বিচরণ করিতে পারে না; মনুষ্য কেবল উত্থানাবস্থায় বিচরণ করিতে পারে। মনুষ্যের শরীর যেমন সদা উত্থানবান্ তেমনি তাহার আত্মাও সর্ব্বদা উত্থানবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। মনুষ্য সেই অমৃতের পুত্র; সে যদি সর্ব্বদা পাপে মলিন, শোকে আকুল, ও রিপুর বশীভূত থাকে তবে তাহার আর কি মর্য্যাদা থাকে? পক্ষী যেমন পৃথিবীর অব্যবহিত উপরি ভাগের মলিন অবিশুদ্ধ বায়ু পরিত্যাগ করিয়া, আকাশের উচ্চ প্রদেশে উত্থিত হইয়া, তথাকার লঘু ও পবিত্র বায়ু সেবন পূর্ব্বক কৃতার্থ হয় সেইরূপ মনুষ্য সংসারের মলিনতা ও অধমতা নিম্নে রাখিয়া, ধর্ম্মাকাশে উত্থিত হইয়া, তথাকার লঘুত্ব ও আরোগ্যপ্রদ পবিত্র বায়ু সেবন পূর্ব্বক একেবারে কৃতার্থ হয়। হে মোহাক্রান্ত ব্যক্তি! তুমি সংসারকে সার জ্ঞান করিয়া তাহাতে নিতান্ত আসক্ত হইয়া ক্রমে অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছ! " উত্তিষ্ঠত " উত্থান কর, সেই অবিনাশী সারাৎসার পদার্থের নিকট গমন কর. এই ভয়াবহ সংসারে কেবল তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করা শান্তি লাভের এক মাত্র উপায়। হে শোকাকুল! তুমি কেন শোক-শয্যায় পতিত আছ? "উত্তিষ্ঠত" উত্থান কর, তোমার বিবেচনা করা কর্ত্তব্য

যে যখন আমরা মনুষ্যকে ভাল বাসি, তখন আমরা কি ধূলি-নির্ম্মিত ভঙ্গুর পদার্থ ভাল বাসি! তোমার বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে যাহার জন্য তুমি শোক করিতেছ তদপেক্ষা প্রিয় পদার্থ এক জন আছেন,তাঁহাকে প্রীতিকর এবং তাঁহার প্রিয় জীবদিগের উপকার সাধন কর,মৃতের জন্য শোক করিয়া জীবিতদিগের প্রতি কর্ত্তব্য অবহেলন করিও না। হে পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন ব্যক্তি! অমৃতের পুত্র হইয়া তোমার এই দুর্গতি কেন? "উত্তিষ্ঠত" উত্থান কর, মহাবীর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক পাপের শৃঙ্খল একবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পরম উপাদেয় স্বাধীনতা লাভ পূর্ব্বক সেই পুত্রত্ব সার্থক কর, হৃদয়ের নিত্য সূর্য্যালোকস্বরূপ আত্ম-প্রসাদ লাভ কর, বাহ্য ঘটনার উপর আমাদিগের কর্ত্তৃত্ব নাই, সহস্র বিপদপাৎ হইলেও যদি আমাদিগের ধর্ম্ম স্থির থাকে তাহা হইলে ভয়ের কিছু মাত্র কারণ নাই। হে মনুষ্যগণ! ধর্ম্ম কেবল উচ্চৈঃস্বরে এই মাত্র তোমাদিগকে সর্ব্বদা বলিতেছেন "উত্তিষ্ঠত, উত্তিষ্ঠত"। তাঁহার এই উদ্দীপক বাক্য শ্রবণ কর, যেহেতু ধর্ম্ম কেবল মনুষ্যের এক মাত্র সুহৃৎ, মৃত্যুর পর ধর্ম্মই কেবল আমাদিগের অনুগামী হয়েন, আর সকলই শরীরের সহিত বিনাশ পায়। ধর্ম্মকে রক্ষা করিলে তিনি আমাদিগকে রক্ষা করেন, ধর্ম্মকে হনন করিলে তিনি আমাদিগকে হনন করেন। অতএব ধর্ম্মকে নাশ করিবে না, ধর্ম্ম হত হইয়া আমাদিগকে নষ্ট না করুন।

" একএব সুহৃদ্ধর্ম্মোনিধনেপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি॥
ধর্ম্মএব হতো হন্তি, ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাদ্ধর্ম্মোন হন্তব্যোমা নোধর্ম্মোহতোবধীৎ॥"

বৈদিক সময়ে পরকালে বিশ্বাস।

পূর্ব্ব জন্মের অস্তিত্ব বিষয়ে লোকের সন্দেহ হইতেও পারে, কিন্তু পরকালের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন ব্যক্তিরই সন্দেহ নাই। আমরা দেখিতে পাই যে আত্মার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ইহলোকে হইতে পারে না, সুতরাং আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয় যে মৃত্যুর পরও আত্মার উন্নতি হইবে। ঈশ্বর ন্যায়বান অতএব লোকের বিশ্বাস এই যে সকলেই পরকালে স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে পুরস্কৃত বা দণ্ডিত হইয়া থাকে। আমরা এ প্রস্তাবে বৈদিক কালে ঋষিদিগের পরকাল বিষয়ে কি মতামত ছিল তাহা বিবৃত করিব।

ঋগ্বেদসংহিতার নবম এবং দশম মণ্ডলেই পরকালের বিষয় পরিস্ফুট এবং উন্নত ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। অন্যান্য মণ্ডলে পরকালের কথা আছে সত্য,কিন্তু পরিস্ফুট ভাবে নাই। ঋগ্বেদের প্রথম এবং চতুর্থ মণ্ডলে দৃষ্ট হয় যে ঋভুগণ শিল্পচাতুরীর নিমিত্ত অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। আর অনেক স্থল পাঠ করিয়া বুঝিতে পারা যায় যে ঋষিগণ পরকালকে সুখজনক বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের ৪৮ সূক্তে লিখিত আছে যে "আমরা সোম পান করিয়াছি, আমরা অমরত্ব লাভ করিয়াছি, আমরা আলোকে প্রবেশ করিয়াছি, আমরা দেবগণকে জানিতে পারিয়াছি।" ঋগ্বেদের ১ মণ্ডলের ১২৫ সূক্তে দৃষ্ট হয় "যাঁহারা দান করেন তাঁহারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েন।" আর ১৫৪ সূক্তে লিখিত আছে "আমি যেন বিষ্ণুর সেই প্রিয় আবাসস্থান প্রাপ্ত হই যেস্থানে দেবভক্ত উপাসক সকল অমৃত পান করিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসমান হয়েন।" ষষ্ঠ মণ্ডলের ৪৭ সূক্তে উল্লিখিত

হইয়াছে "ইন্দ্র তাঁহার উপাসকদিগকে প্রশস্ত স্থানে, স্বর্গীয় জ্যোতিতে, নিরাপদে এবং সম্পদে লইয়া যান।" প্রথম মণ্ডলের ৩১ সূক্তে এবং ষষ্ঠ মণ্ডলের ৭ সূক্তে অগ্নিদেবকে অমরত্বদাতা বলা হইয়াছে।

দশম মণ্ডলের ১৪ এবং ১৭ সূক্তে বর্ণিত আছে যে যম বিবস্বৎ ও সরণ্যুর পুত্র। সরণ্যু ত্বষ্টৃদেবের কন্যা। যম প্রথম মনুষ্য বলিয়া অনেকত্র উল্লিখিত। যম মৃত্যুর পর পরলোকের পথ দেখিতে পান এবং তদবধি তাঁহার আবিষ্কৃত পথে মনুষ্যগণ পরলোকে নীত হইয়া সকলে এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে মিলিত হয়। নবম মণ্ডলের ১১৩ সূক্তে দৃষ্ট হয় যে, যম স্বর্গের অন্তরতম পবিত্র প্রদেশে স্বর্গীয় জ্যোতি মধ্যে বাস করেন এবং তিনি তথাকার রাজা। যে স্থানে তিনি ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের বাসের নিমিত্ত জ্যোতিঃপূর্ণ গৃহ সকল প্রদান করেন তথায় ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ সুখে কালযাপন করেন। ঋগ্বেদের কুত্রাপি যমকে পাপীদিগের দণ্ডপ্রদাতা বলিয়া উল্লেখ দেখা যায় না। কিন্তু কিয়দংশে যম ভয়জনক। দশম মণ্ডলের ১৪ সূক্তে যমের দুই ভয়ঙ্কর কুকুরের বর্ণনা আছে। ইহারা তাঁহার রাজ্যের পথ রক্ষা করে, তাঁহার দূতস্বরূপ লোকমধ্যে বিচরণ করে এবং লোকদিগকে যথাকালে যমালয়ে আনয়ন করে। মৃত্যুর পর মনুষ্যের শরীর ভস্মীভূত করা হয় কিন্তু আত্মা অসম্পূর্ণ অংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, পিতৃগণের পথ দ্বারা দেবজ্যোতিতে ভূষিত হইয়া অনন্ত জ্যোতির প্রদেশে উত্থিত হয়। সে প্রদেশে উপস্থিত হইয়া আত্মা আপনার পূর্ব্বতন স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, পিতৃগণের সহিত সাক্ষাৎ করে, যমের নিকট হইতে বাসার্থ সুখকর স্থান প্রাপ্ত হয় এবং অধিকতর সম্পূর্ণ জীবনে প্রবেশ করে। এই জীবনে সকল ইচ্ছা সম্পন্ন হয়, দেবগণের নিকটে বাস করে এবং দেবগণের আনন্দের অংশী হয়। ইহাই পরকালের কথা। পরকালের সুখ সম্ভোগ ঋগ্বেদের নবম মণ্ডল ১১৩ সূক্তে বর্ণিত হইয়াছে। "হে পবিত্র সোম, আমাদিগকে সেই অক্ষয় ও অপরিবর্ত্তনশীল লোকে স্থাপন কর যেখানে অনন্ত জ্যোতিঃ এবং মহিমা প্রকাশ পাইতেছে, যেখানে যমরাজ আছেন, যেখানে স্বর্গের পাবন ক্ষেত্র বিদ্যমান, যেখানে ইচ্ছা অনিয়ন্ত্রিত এবং মুক্ত, যেখানে সুখ এবং যেখানে লোকে কখন কোন বিষয়ে নিরাশ হয় না"

যে যে কার্য্য করিলে লোকে পরকালে সুখ প্রাপ্ত হয় এবং অনন্ত আনন্দ উপভোগ করে তাহা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৫৪ সূক্তে উল্লিখিত আছে। দেবগণকে আজ্যাদি নিবেদন, তপস্যাচরণ, পরহিত সাধনে জীবন প্রদান, সদুদ্দেশ্যে দান, সদনুষ্ঠান এবং ঈশ্বরের একাগ্র উপাসনা এই সমস্ত দ্বারা লোকে দুঃখ দ্বারা অসম্ভিন্ন আনন্দ পরকালে উপভোগ করে। ঋগ্বেদের ১। ১২৫ ঋকে দেখা যায় যে "যিনি সৎপাত্রে দান করেন, তিনি অমরত্ব লাভ করেন, দেবলোকে গমন করেন এবং অনন্ত আনন্দ উপভোগ করেন। দানশীল ব্যক্তিরা (১০।১০৭।২) কখন মৃত হয়েন না, বিনাশ প্রাপ্ত হয়েন না এবং ক্লেশ ভোগ করেন না।

দশম মণ্ডলের পঞ্চদশ সূক্তে পিতৃগণের উল্লেখ আছে। পিতৃগণ অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্ববংশীয়দিগের পূজ্য হইয়াছেন। পিতৃগণ অনেক বিধ—অঙ্গিরস, বৈরূপ, নবাস্ব, অথর্ব্বান্, ভৃগু, বশিষ্ট প্রভৃতি। পিতৃগণের বংশীয় ভক্ত উপাসক সমূহ পিতৃগণের অর্চনা করে, অনুগ্রহ প্রার্থনা করে, দোষ ক্ষমা করিতে বলে, ধনদান করিতে প্রার্থনা করে এবং স্বভক্তদিগকে রক্ষা করিতে

বলে। পিতৃগণ যম, বিবস্বৎ এবং অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের সহিত আগমন করেন এবং অর্পিত হবি গ্রহণ করেন। পিতৃগণ ইন্দ্রাদি দেবের রথে আরোহণ পূর্ব্বক যজ্ঞ-প্রদেশে আসিয়া থাকেন।

পাপের দণ্ড অনেক স্থলে উল্লিখিত আছে। ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের ৫ সূক্তে দৃষ্ট হয় যে, দুষ্ট সত্যরহিত অবিশ্বস্ত ব্যক্তিরা অতল গভীর প্রদেশে পতিত হয়। ৭ মণ্ডলের ১০৪ সূক্তে দৃষ্ট হয় ইন্দ্র এবং সোম হিংসাপ্রবণ রাক্ষসাদি জাতিকে অতল অন্ধকারপূর্ণ গহ্বরে নিক্ষেপ করেন। অধার্ম্মিক লোক সকল অধম তমসে নিপতিত হয়। কৃপণ ব্যক্তিরা নরকলোকে বাস করে।

বৈদিক কালে ঋষিদিগের পরকাল বিষয়ে মতামত বিবৃত হইল। পরকালের অস্তিত্ব তাঁহারা স্বীকার করিতেন। আত্মার যে পরকালে উন্নতি এবং সুখভোগ হয় তাহাও তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার তাঁহারা মানিতেন। সৎকর্ম্ম-ফলে অমৃতত্ব লাভ এবং পরকালে আনন্দোপভোগ তাঁহাদিগের চিত্তকে সৎকর্ম্মের দিকে প্রবণ করিত। ঋষিদিগের ধর্ম্মভাব পূর্ব্বে সমালোচিত হইয়াছে। পূর্ব্ব জন্ম বিষয়ে বৈদিক কালীন ঋষিগণের মতামত আমরা প্রস্তাবান্তরে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

বৈদিক সময়ের ঋষিগণ।

বৈদিক ঋষিগণ সমস্ত আর্য্য বংশকে মনু হইতে উৎপন্ন স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। মনু আর্য্যদিগের আদি পুরুষ ইহা বেদে অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়। মনু হইতে উৎপন্ন বৈদিক আর্য্য ঋষিগণ সমাজে কিরূপ অবস্থায় থাকিতেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে কোন সামাজিক বিভাগ ছিল কি না তাহা প্রদর্শন করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে ঋষিগণই বেদমন্ত্রের রচয়িতা। ঋষিগণ বেদমন্ত্র সমূহ স্বস্ব প্রণীত বলিয়া অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। বেদে বেদমন্ত্রের বহুবিধ নাম দেখিতে পাওয়া যায়; যথা অর্ক, উক্‌থ, ঋচ্, গির্, ধী, নিথ, নিবিৎ, মন্ত্র, মতি, সূক্ত, স্তোম, বচ, বচস্ প্রভৃতি। এই সমস্ত বাক্যের অর্থই বেদমন্ত্র। এতদ্ভিন্ন আর একটি শব্দ দৃষ্ট হয়, তাহা ব্রহ্মন্। ব্রহ্মশব্দের নানার্থ। সচরাচর বেদে ব্রহ্মশব্দ স্তুতিবোধক। কিন্তু যখন ব্রহ্মন্ শব্দ পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হয় তখন ইহা স্তুতিকারী বুঝায়। ঋকবেদের ভূরি ভূরি প্রয়োগ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে যেস্থলে ব্রহ্মন্ শব্দের প্রথমতঃ স্তুতি অর্থ; দ্বিতীয়তঃ স্তুতিকারী অর্থ এবং তৃতীয়তঃ ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্-বিশেষ অর্থ। দ্বিতীয় স্তুতিকারী অর্থের আবার দ্বিবিধ প্রয়োগ আছে। কোন কোন স্থলে বিপ্র, বেধস্, কবি প্রভৃতি অর্থে প্রয়োগ এবং কোন কোন স্থলে যজ্বা, পুরোহিত প্রভৃতি অর্থে প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

সর্ব্ব প্রথমে ঋষিগণই পুরোহিত ছিলেন, যেহেতু যে যে স্থলে তাঁহারা আপনাদিগের দানপ্রাপ্তির উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সেই স্থলে অন্য কোন কার্য্যসম্পাদক পুরোহিতের উল্লেখ করেন নাই। যাঁহারাই বেদমন্ত্র রচনা করিতেন তাঁহারাই দেবগণের স্তব করিতেন এবং দানশীল ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত যাগাদি কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। অন্য কোন পুরোহিত তৎকালে ছিল না। সেই আর্য্যসমাজের প্রথম অবস্থা। তখন যাঁহারাই বেদমন্ত্রের রচক কবি ছিলেন তাঁহারাই কার্য্যসম্পাদক পুরোহিত ছিলেন। ক্রমশঃ আর্য্যসমাজে যজ্ঞবাহুল্য ঘটিল

এবং যাগাদি কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য অনেক পুরোহিতের প্রয়োজন হইল। তখন এক দল পুরোহিত হইলেন যাঁহারা বেদমন্ত্র-রচয়িতা ছিলেন না; কিন্তু কেবল মাত্র দেব-যজন করিতেন। পরে আর যত যজ্ঞ-বাহুল্য হইতে লাগিল ততই নানা প্রকার পুরোহিতের আবশ্যকতা হইল। হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু, নেষ্টা, পোতা, ব্রহ্মা প্রভৃতি বহু সংখ্যক পুরোহিত উদ্ভূত হইলেন। এক ব্রহ্মন্ শব্দ এই তিন সময়ের সাক্ষ্য দিতেছে। প্রথমে ইহা স্তোতা, কবি, বিপ্র প্রভৃতি বুঝাইত, পরে যজ্বা, পুরোহিত বুঝাইয়াছে এবং অবশেষে ব্রহ্মা নামে এক বিশেষ পুরোহিত বুঝাইল। ঋগ্বেদের ১মণ্ডলের ৮০ সূক্ত ১ ঋক্; ১।১৬৪।৩৪; ২।১২।৬; ৬।৪৫।৭; ৮।১৬।৭; ১০।৭০।১; ১০।৮৫।৩; ১০।১০৭।৬; ১০।১২৫।৫ প্রভৃতি স্থলে স্তোতা বিপ্র অর্থে ব্রহ্মা শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এই সকল স্থলে ব্রহ্মা, স্তোতা, ব্রহ্মবাহস্, ঋষি, কবি, বিপ্র; সুমেধ, সামগ প্রভৃতি সমস্তই একপর্য্যায় শব্দ।

দ্বিতীয়তঃ ঋগ্বেদের ১ম ১০ সূক্ত ১ ঋক্; ১।৩৩।৯; ১।১০।১৫; ১।১০৮।৭; ১।১৫৮।৬; ২।৩৭।১; ৪।৫০।৭; ৪।৫৮।২, ৫।৩১।৪; ৫।৪০।৮; ৭।৭।৫; ৭।৩৩।১; ৮।৭।২০; ৮।১৭।২; ৮।৩১।১; ৮।৩২।১৬; ৮।৩৩।১০ ৮।৪৫।৩৯; ৮।৫৩।৭; ৯।৯৬।৬; ৯।১১২।১; ১০।২৪।১১; ১০।৮৫।১৯; ১০।১৪১।৩ প্রভৃতি স্থলে ব্রহ্মশব্দ পুরোহিত অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহাঁরা বেদমন্ত্র রচনা করিতেন না কিন্তু অন্য ঋষি কর্ত্তৃক রচিত মন্ত্রের দ্বারা দেবার্চ্চনা ও উপাসনা করিতেন।

তৃতীয়তঃ ঋগ্বেদের ২।১।২; ৪।৯।৩; ১০।৫২।২; ১০।৯১।১০ প্রভৃতি স্থলে ব্রহ্মাশব্দ ব্রহ্মাখ্য ঋত্বিগ্বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। উদ্ধৃত প্রথম ও শেষ ঋকে অগ্নিকে হোতা, পোতা, নেষ্টা, অগ্নিৎ, প্রশস্তা, অধ্বর্য্যু এবং ব্রহ্মা বলা হইয়াছে। ১০৫২।২ ঋকে অশ্বিনীকুমারদিগকে উক্ত হইয়াছে "হে আশ্বিন, প্রতি দিন আমি আপনাদিগের অধ্বর্য্যুর কার্য্য করিতেছি এবং ব্রহ্মা অগ্নি প্রজ্বালিত করিতেছেন।"

অতএব আমরা দেখিলাম যে ব্রহ্মাশব্দে আর্য্যসমাজের তিন ক্রমিক উন্নত অবস্থায় তিন অর্থ বুঝাইয়াছে। এক্ষণে দেখা উচিত ব্রাহ্মণ শব্দের ঋগ্বেদে কিরূপ ব্যবহার আছে। দ্বিতীয় মণ্ডলে ৪৩ সূক্তের ২ ঋকে ব্রহ্মপুত্র শব্দ দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ ব্রহ্মপুত্র। ঋগ্বেদে ১।১৬৪।৪৫ লিখিত আছে যে ব্রাহ্মণেরা চতুর্বিধ ভাষা জানেন কিন্তু সাধারণ লোকে এক প্রকার ভাষা মাত্র জানে। আর ৬।৭৫।১০; ৭।১০৩।১; ১০।১৬।৬; ১০।৭১।১; ১০।৯০।১১ প্রভৃতি ঋকে ব্রাহ্মণ শব্দ দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ সম্পাদক, সোমপায়ী, জাতবিদ্য প্রভৃতি গুণসম্পন্ন ছিলেন। ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বত্র মান্য গণ্য এবং পূজনীয় হইতেন। ধনী ব্যক্তিরা এবং নৃপতিগণ সর্ব্বদা ব্রাহ্মণদিগকে দানাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিতেন। ঋগ্বেদ পাঠে আমরা অবগত হই যে সুদাস, পাকস্থমন, তুর্বসু, চেদিবংশীয় কশু, পুরুকুৎস, ত্রসদস্যু প্রভৃতি রাজগণ ব্রাহ্মণদিগকে নানাবিধ ধনদান করিতেন। ব্রাহ্মণেরা রাজগণের মঙ্গল সাধনের নিমিত্ত দেবগণকে অর্চ্চনা ও উপাসনা করিতেন। ব্রাহ্মণগণ সর্ব্ববিদ্যার আধার ছিলেন এবং মনুষ্য ও দেবগণের মধ্যস্থলীয়। দেবগণের প্রীতিসাধন করিতে হইলে ব্রাহ্মণদিগের আশ্রয় লইতে হইত। ব্রাহ্মণদিগের সাহায্যে দেবগণের অর্চ্চনা হইতে পারিত। সুতরাং ব্রাহ্মণদিগের এত অধিক গৌরব ও সম্মান ছিল। ক্রমশঃ ব্রাহ্মণদিগের এক শ্রেণী হইয়া পড়িল।

সর্ব্বপ্রকার দেবকার্য্যেই ব্রাহ্মণের প্রয়োজন সুতরাং ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ গৌরব। কিন্তু তখনও ব্রাহ্মণেরা আধুনিক ব্রাহ্মণজাতির ন্যায় জাতি হইয়া উঠেন নাই। পৌরোহিত্য সম্পাদনের নিমিত্ত ব্রাহ্মণশ্রেণীর প্রয়োজন হইয়াছিল, সুতরাং আর্য্যসমাজে ব্রাহ্মণেরা পুরোহিত হইলেন। এই পুরোহিত-শ্রেণীর মধ্যে রাজন্য ঋষিরও উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে (১০।১০৯ প্রভৃতি স্থলে) এবং অথর্ব্ববেদে (৫। ১৭। ৪ প্রভৃতি স্থলে) দৃষ্ট হয় যে ব্রাহ্মণেরা রাজন্য এবং বৈশ্য বিধবাদিগকে বিবাহ করিতেন। বৈদিক সময়ে যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল তাহা অথর্ব্ববেদের ৯।৫।২৭ হইতে প্রমাণিত।

আর আমরা দেখিতে পাই যে (ঋগ্বেদ পঞ্চম মণ্ডল ৬১সূক্ত) রথবীথী রাজার কন্যার সহিত শ্যবস্ব ঋষির এবং শতপথ ব্রাহ্মণে দেখি শর্য্যাতরাজপুত্রী সুকন্যার সহিত চ্যবন ঋষির বিবাহ হইয়াছিল। তৎকালের প্রচলিত প্রথানুসারে ব্রাহ্মণেরা রাজন্য এবং বৈশ্যকন্যার পাণিগ্রহণ করিতেন। কিন্তু ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের নবতি সূক্তের দশমাদি ঋকে যে ব্রাহ্মণ, রাজন্য, বৈশ্য এবং শূদ্রের উল্লেখ আছে তাহার অর্থ কি? এই স্থলে এরূপ উল্লেখ নাই যে ব্রাহ্মণ পুরুষের মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, রাজন্য পুরুষের বাহু হইতে এবং বৈশ্য উরু হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। কেবল শূদ্রের বিষয়ে পদ হইতে জাত বলা হইয়াছে। এই স্থলে উক্ত হইয়াছে যে ব্রাহ্মণ পুরুষের মুখ ছিলেন, রাজন্য বাহু ছিলেন এবং বৈশ্য উরু ছিলেন। ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে ব্রাহ্মণেরা সকলের মান্য এবং পূজ্য ছিলেন। রাজন্যগণ সকলের রক্ষক ছিলেন এবং বৈশ্যগণ বাণিজ্য ব্যবসায়াদি দ্বারা সকলের ধারক ছিলেন। ব্রাহ্মণেরা সকলের পূজ্য ছিলেন বলিয়া পুরুষের মুখস্বরূপ। রাজন্যেরা সকলের পালক ও রক্ষক ছিলেন বলিয়া বাহুস্বরূপ। বৈশ্যেরা ব্যবসায়ী বলিয়া উরু স্বরূপ। শূদ্রেরা সকলের নিম্নস্থ ছিল বলিয়া পুরুষের পাদ স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত উক্ত পুরুষসূক্ত অপেক্ষাকৃত আধুনিক সূক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহা বৈদিক সময়ের চরম কালে রচিত হইয়াছিল। বেদসূক্তের প্রাচীনত্ব এবং নূতনত্ব জানিবার বিশেষ লক্ষণ আছে। যে সকল সূক্ত পাঠ করিলে ভাব সরল, ভাষা সরল, রীতি সরল বলিয়া বোধ হয় এবং স্বাভাবিক বাক্যস্ফূরণ বলিয়া প্রতীতি জন্মে সেই সকল প্রাচীন সূক্ত। আর যে সকল সূক্ত পাঠ করিয়া চিন্তাশীলতার পরিচয়, যজ্ঞবাহুল্যের কথা, ভাবের নবীনত্ব এবং ভাষার আধুনিকত্ব দেখা যায় সে সমস্তই অপেক্ষাকৃত নূতন সূক্ত। বিচার্য্যমান পুরুষসূক্তে ভাষার আধুনিকত্ব, ভাবের নূতনত্ব এবং রীতির নব্যত্ব দৃষ্ট হয়। অতএব ইহা প্রাচীন সূক্ত নহে, শেষ সময়ের রচিত। এতৎ প্রমাণ সমূহ সত্ত্বেও যদি কেহ কেহ ইহার প্রাচীনত্ব অস্বীকার করিতে না ভাল বাসেন, আমরা তাহাদিগকে এই মাত্র বলিব যে তাহাদিগের অনুকূল তর্ক কিছুই নাই, প্রত্যুত অনেক প্রতিকূল তর্ক দেদীপ্যমান রহিয়াছে। আর ঋগ্বেদের শেষ মণ্ডলের শেষে এক মাত্র অস্পষ্ট বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া দৃঢ় প্রমাণাভাবে বৈদিক আর্য্যসমাজে জাতিভেদ প্রবল ছিল বলিয়া স্থির করা কোন প্রকারেই যুক্তিসঙ্গত নহে। বৈদিক আর্য্যসমাজে অনেক প্রকার লোক ছিল; তন্মধ্যে ব্রাহ্মণেরা এবং রাজন্যেরা পুরোহিত ছিলেন। ব্রাহ্মণ-ঋষিই অনেক কিন্তু রাজন্য-ঋষিও ছিলেন। সায়ণাচার্য্য ঋগ্বেদের অনুক্রমণি-

কাতে ঋজ্রশ্ব, সহদেব, অম্বরীষ, ভয়মান, সুরাধস্ প্রভৃতিকে রাজর্ষি বলিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ত্রসদস্যু, ত্র্যরুণ, পুরুমীঢ়, অজমীঢ়, সিন্ধুদ্বীপ, সুদাস, মান্ধাতা, সিবি, প্রতর্দন, পৃথিবৈন্য, কক্ষীবান্ প্রভৃতি বহু সংখ্যক রাজর্ষি ছিলেন। ইহাঁরা সকলেই বেদ-সূক্তের রচয়িতা ঋষি ছিলেন। দুই এক স্থলে শূদ্র ঋষির উল্লেখ পাওয়া যায়। কবষ ঐলূষ নামে দশম মণ্ডলে একজন নিষাদ ঋষি আছেন। সুতরাং নিঃসন্দেহ প্রমাণ হইতেছে যে বৈদিক যুগে আধুনিক জাতিভেদ ছিল না। যাঁহারাই শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া দেবযজনের এবং বেদমন্ত্র উচ্চারণের উপযুক্ত এবং সমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহারাই ঋষি হইয়াছিলেন। যাঁহারাই আর্য্যসমাজে তখন পৌরোহিত্য করিতেন তাঁহারা ব্রহ্মাশব্দের বাচ্য ছিলেন। বৈদিক ঋষিদিগের সমাজে বিশেষ আদর এবং সম্মান ছিল। ধনী ব্যক্তিরা তাঁহাদিগকে অশ্ব, গো, ধান্য, ধন প্রভৃতি প্রদান করিতেন। এই সকল দানশীল ব্যক্তিগণের অনেক স্তুতি ঋগ্বেদে আছে ; তৎসমুদায়কে দানস্তুতি কহে।

বৈদিক আর্য্যসমাজে ঋষি এবং পুরোহিত ব্যতীত অন্য বহুবিধ ব্যবসায়ী বহু প্রকার লোক ছিল। এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিদ্বেষী অনেক শত্রুও ছিল ঋষিগণ ইহাদিগের অদেব, অনিন্দ্র, অব্রত, অযজ্ঞ, অন্যব্রত, অপব্রত, দেবনিদ্, ব্রহ্মদ্বিষ প্রভৃতি বিশেষণ দিয়াছেন। আর এবম্ভূত অনেক লোক ছিল যাহারা বেদবোধিত ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও ইন্দ্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিত না। দ্বিতীয় মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের পঞ্চম ঋকে উক্ত হইয়াছে "যে ইন্দ্রের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন কোন লোক অবিশ্বাস করে, সেই ইন্দ্রদেবের অস্তিত্ব এবং প্রভাবে বিশ্বাস কর"। পুনর্বার ৮।৮৯।৩ ঋকে আছে, "ইন্দ্রকে স্তুতি কর, যদি তিনি থাকেন। কেহ কেহ বলে ইন্দ্র নাই, কে তাঁহাকে দেখিয়াছে ? তবে আমরা কাহাকে স্তুতি করিব ? ভক্ত উপাসক এরূপ সন্দেহযুক্ত হইলে ইন্দ্র তাহাকে বলেন হে উপাসক, এই আমি আমাকে দর্শন কর, আমি সর্ব্বভূতময়।" যে সংশয়বাদ কপিল মুনিতে চরমাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার অঙ্কুর ঋগ্বেদেও দৃষ্ট হয়। এই সকল সংশয়াত্মা দেববিদ্বেষী বৈদিক সময়ে থাকিলেও পুরোহিতগণ বেদবোধিত সদনুষ্ঠানে লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেন। ইহা কেবল তাঁহাদিগের শাস্ত্রজ্ঞানের এবং দেবার্চ্চনার প্রভাবে তাঁহারা করিতেন। তাঁহারা যে কেবল দেবকার্য্যেই নিযুক্ত থাকিতেন তাহা নহে। বৈদিক সময়ের ঋষি ও পুরোহিতগণ আপনাদিগের নিমিত্ত ধন, ধান্য, পুত্র, গৃহ, গো, অশ্ব প্রভৃতি দেবগণের নিকট প্রার্থনা করিতেন। তাঁহারা সংসারানভিজ্ঞ ছিলেন না; কিন্তু কিরূপে সামাজিক সকল শ্রেণীকে চালিত করিতে হয় তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। অতএব প্রতিপন্ন হইল যে বৈদিক সময়ে পুরোহিতগণ দেবযজন, স্বধর্ম্মানুষ্ঠান, স্বধর্ম্মপ্রচার এবং বেদমন্ত্র রচনা করিতেন। তাঁহারা এক প্রকার সমাজের নেতা এবং পথপ্রদর্শক ছিলেন।

যোগিগণের সাধনতত্ত্ব।

(যোগশাস্ত্র মূলক)

মনুষ্য বিনা চেষ্টায় কিছুই পায় না। এক একটি বিষয়ে সিদ্ধ হইতে যে মনুষ্যের কত অভ্যাস; কত আয়াস, কত অনুষ্ঠান ও কত উপায় উদ্ভাবন আবশ্যক হয় তাহা যিনি করিয়াছেন তিনিই জানেন।

কোন কার্য্য করিতে হইলে প্রথম হইতে

প্রস্তুত হইতে হয়। অগ্রে প্রস্তুত না হইয়া, আপনাতে কার্য্য-শক্তির উদ্রেক না করিয়া সহসা যিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, কার্য্যসিদ্ধি দূরে থাকুক, হয়ত তিনি বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়েন। অতএব অগ্রে প্রস্তুত হইয়া পশ্চাৎ কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতরণ করাই কর্ত্তব্য। প্রস্তুত হইবার অবলম্বিত বিষয় বিশেষের নাম অধিকার, আর যিনি প্রস্তুত হইয়াছেন তিনি অধিকারী। ইহাই অধিকার ও অধিকারীর সাধারণ লক্ষণ। যিনি যে কার্য্যের উদ্দেশে প্রস্তুত, তিনিই সেই কার্য্যকরণে অধিকারী বা যোগ্য পাত্র। যিনি প্রস্তুত হন নাই তিনি অনধিকারী বা অযোগ্য পাত্র।

"নহ্যনধিকৃতং কর্ম্ম কিঞ্চিদপি ফলংজনয়তি।"

যেহেতু অনধিকারীর কৃত কোন কর্ম্মই সুফল প্রসব করে না, সেই হেতু "অধিকারিণা ভবিতব্যম" অগ্রে আপনাতে অধিকারিত্ব সম্পাদন করিতে হইবেক।

"অগ্রে অধিকারী হইতে হইবেক" ইহাই যদি নিয়ম হইল, তবে যোগী হইতে গেলেও অগ্রে যোগাধিকার আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। অধিকারী না হইয়া, অগ্রে প্রস্তুত না হইয়া, যোগসাধনে হঠাৎ প্রবৃত্ত হইলে যোগসিদ্ধি হওয়া দূরে থাক, বিপদ আসিয়া আশ্রয় করিবেক। এই জন্যই

"প্রথমতঃ ক্রিয়াযোগমুপদিশন্তি স্বত্রকারাঃ সামর্থ্য জননায়।"

যোগী হইবার সামর্থ্য উৎপাদনের নিমিত্ত যোগসূত্র-রচয়িতাগণ সর্ব্বাগ্রে ক্রিয়া-যোগের উপদেশ করিয়াছেন। "ভবিষ্যতে যোগী হইবার ইচ্ছা থাকিলে প্রথমে ক্রিয়া-যোগ আশ্রয় করিবেক।"

"তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ।"

(পা, সা,)

তপশ্চর্য্যা, স্বাধায়, ঈশ্বরপ্রণিধান, এই তিনটির নাম ক্রিয়াযোগ।

তপস্যা—কৃচ্ছ্র, অতিকৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত ব্রত।

স্বাধ্যায়—প্রণব প্রভৃতি ঈশ্বরবাচক শব্দের জপ ও মোক্ষ শাস্ত্রের অনুশীলন।

ঈশ্বরপ্রণিধান—ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্ম করা।

জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ তুলসীদাস ইহা উত্তম রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন যথা—

"তুলসী য্যাসা ধেয়ান্ ধর্
য্যাসা বিয়ান্ কা গাই।
মুমে তৃণ চানা টুটে
চেৎ রাখয়ে বাছাই॥"

রে তুলসি! তুমি এরূপ করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিবে, যেরূপ নবপ্রসূতা গাভী। নবপ্রসূতা গাভী কি করে? নবপ্রসূতা গাভী মুখে তৃণ চর্ব্বণ করে বটে কিন্তু তাহার চিত্ত বৎসের দিকেই থাকে।

এই নবপ্রসূতা গাভীর দৃষ্টান্তে ভবিষ্যৎ যোগীরা ঈশ্বর-প্রণিধান শিক্ষা করিবেন।

তপস্যা কেন? "নাতপস্বিনো যোগঃ সিধ্যতি।" সহস্র চেষ্টা করিলেও অতপস্বী ব্যক্তির যোগসিদ্ধি হইবে না। জীবের চিত্তে অনাদি কালের বিষয়-বাসনা ও অবিদ্যা-বাসনা বদ্ধমূল হইয়া আছে। তপস্যা ব্যতীত তাহার লোপ সম্ভাবনা নাই। বাসনা থাকিতে যোগসিদ্ধি হয় না সুতরাং বাসনা ক্ষয়ের নিমিত্তই তপস্যা করিতে হইবে। বাসনা কি? তাহা একটু স্থিরচিত্তে বুঝ—

মনে কর, কোন যুবা আহারান্তে নিদ্রা গেল। দুই চারি দিন নিদ্রা যাইতে যাইতে তাহার এমনি অভ্যাস হইয়া আসিল যে আহারান্তে নিদ্রা যাইতেই হইবেক। এরূপ হয় কেন? না মনুষ্যের মন, বুদ্ধি, শরীর সমস্তই প্রসঙ্গপ্রবণ। যে বিষয়ের প্রসঙ্গ করে সেই বিষয়েই নত হয়। যে রূপে, যখন ও যে আকারে

প্রসঙ্গ করে সেইরূপে, তখন ও সেই আকারে তদ্বিষয়ে উন্মুখ বা ধাবিত হয়। মন সেই ভাবে সেই সময়ে সেই দিকেই দৌড়ায়। এই প্রসঙ্গে প্রবণতাকেই লোকে নেসা বলিয়া থাকে। শাস্ত্রকারেরা ইহাকে অভ্যাস, সংস্কার ও বাসনা নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন। যখন দেখা যাইতেছে যে মনুষ্য দুই চারি দিন মাত্র স্ত্রী-প্রসঙ্গ ক্রীড়া-প্রসঙ্গ করিয়া তদুত্থ বাসনা-জালে অভিভূত হইয়া কর্ম্মের বাহির হইয়া পড়ে, তখন সে অনাদি কালের বদ্ধমূল কর্ম্ম-বাসনা ও ক্লেশ-বাসনা-পরিপূর্ণ চিত্ত লইয়া কি প্রকারে দুঃসম্পাদ্য যোগ-ব্যাপার সাধনে সক্ষম হইবেক? অতএব কর্ম্ম-বাসনা ও ক্লেশ-বাসনা দগ্ধ করিবার নিমিত্ত, সাধক সর্ব্বাগ্রে ক্রিয়া-যোগ আশ্রয় করিবেন।

[সহি ক্রিয়াযোগঃ] "সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ।" [২]

উল্লিখিত ক্রিয়াত্রয় অনুষ্ঠানের অপর প্রয়োজনও আছে। ক্লেশ সকল ক্ষীণ করা এবং সমাধি অবলম্বনের শক্তি উৎপাদন করা। মনুষ্য যদি অকপট ভাবে তপশ্চর্য্যা করে, শ্রদ্ধা সহকারে প্রণব কি অন্য কোন ঈশ্বরের নাম জপ করে, বুঝিয়া বুঝিয়া জ্ঞান শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, ভক্তি পূর্ব্বক ঈশ্বরে চিত্তার্পণ করে, তাহা হইলে অবশ্যই তাহার চিত্ত ফিরিয়া দাঁড়ায়। বিষয়-বাসনার স্রোত ক্রমে অবরুদ্ধ হইয়া আইসে। ক্লেশ সকল ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আইসে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। এস্থলে ক্লেশ অর্থ দুঃখ নহে। ক্লেশ শব্দের অর্থ—

"অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ।"

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচ প্রকার মনোধর্ম্মকে যোগীরা ক্লেশ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই পাঁচটি মনোধর্ম্ম আর কিছুই নহে, ইহা পাঁচ প্রকার বিপরীত জ্ঞান। এই পাঁচ প্রকার প্রত্যয় যত বৃদ্ধি হইবে তত প্রকৃতির অধিকার দৃঢ় হইতে থাকিবেক। যতই প্রকৃতির অধিকার দৃঢ় হইবেক ততই সুখ দুঃখের স্রোত বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং এই পঞ্চবিধ মিথ্যা-প্রত্যয় যাহাতে দগ্ধ হয় তাহার চেষ্টা করা যোগীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

"অবিদ্যাক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নো-দারাণাম্।"

পাঁচটির মধ্যে প্রথমোচ্চারিত অবিদ্যা-টিই পরবর্ত্তী চারিটির ক্ষেত্র অর্থাৎ উৎপত্তি-ভূমি। এক অবিদ্যা হইতেই ক্রমে অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ উপস্থিত হইয়া থাকে। এই সকল ক্লেশকে মানব-চিত্তে চারি প্রকার অবস্থায় বাস করিতে দেখা যায়। কেহ কখন প্রসুপ্ত অবস্থায় আছেন কখন বা তনু অবস্থায়। কেহ কখন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এবং কেহ কখন উদার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া প্রভুত্ব করিতেছেন।

প্রসুপ্ত—বীজের মধ্যে যেমন বৃক্ষ-শক্তি লীন ভাবে থাকে।

তনু—দগ্ধ বীজ যেমন অঙ্কুর-শক্তি-হীন হইয়া থাকে।

বিচ্ছিন্ন—একটির প্রাবল্য দশায় যেমন অন্যটি অভিভূত ভাবে থাকে। যথা—রাগ-কালে ক্রোধ, ক্রোধ কালে রাগ।

উদার—জাজ্বল্যমান অবস্থা। যখন যে ক্লেশ সম্পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন তাহা উদার। অন্য গুলির কেহ প্রসুপ্ত, কেহ তনু, কেহ বিচ্ছিন্ন। ফল কথা এই যে কখন প্রকাশ্য কখন বা অপ্রকাশ্য। প্রকাশ্য রূপে থাকুক, আর অপ্রকাশ্য রূপেই থাকুক, থাকিলেই অনর্থ। সময় পাইলেই সে বিষয়ের অভিমুখে উত্থিত হইবে, নিবারণ করিতে পারিবে না। তবে যদি দগ্ধ বীজের

ন্যায় উৎপাদিকা-শক্তি নষ্ট করিয়া দেওয়া যায় তবে নির্ব্বিঘ্নে জ্ঞান-বল, যোগ-বল সাধিত হইতে পারে।

অবিদ্যা কি?

"অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্ম-খ্যাতিরবিদ্যা।" (৫)

যাহা যাহার স্বরূপ নহে মনুষ্য যে তাহাই তাহাতে দৃঢ় প্রত্যয়ে দেখে, সেই দেখার নামই অবিদ্যা এবং এই অবিদ্যাই সকল অনর্থের মূল। ইহার বিবরণ এই যে, যাহা বাস্তবিক অনিত্য তাহাতেই নিত্যত্ব বুদ্ধি। যাহা বাস্তবিক অশুচি তাহাতেই শুচিত্ব বুদ্ধি। যাহা বাস্তবিক দুঃখ তাহাতেই সুখ বুদ্ধি। যাহা আত্মা নহে তাহাতেই আত্মত্ব বুদ্ধি। এতদ্রূপ সহজাত বা চির-স্বাভাবিক বিপর্য্যয় প্রত্যয়ের নাম অবিদ্যা-ক্লেশ। জীব, দেহগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই এই অবিদ্যা-ক্লেশকে গ্রহণ করে এবং সেই কারণেই জীব অস্মিতার পরবশ হইয়া পড়ে। অস্মিতা কি, বলা যাইতেছে।

"দৃগ্‌দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতৈবাস্মিতা।" (৬)

আত্মার নাম দৃক্-শক্তি। আর বুদ্ধির নাম দর্শন-শক্তি। জীব যে, এই দুইটিকে প্রভেদ করিয়া জানে না, ইহাই জীবের অস্মিতা নামক ক্লেশ। জীব, বুদ্ধি বা মনকে 'আমি' ভাবিয়া রহিয়াছে বলিয়াই সে রাগ নামক ক্লেশের অধীন। রাগ কি? শুন—

"সুখানুশয়ী রাগঃ।" (৭)

সুখের যে অনুশয়, তাহারই নাম রাগ। অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই হউক, আর বর্ণনার দ্বারাই হউক, যে কোন ক্রমে হউক, একবার সুখানুভব হইলে, সময়ান্তরে তাহা মনে হয় [আহা! ইহা এমন!] যেমন মনে হয় অমনি তাহার জন্য ব্যস্ত হয়। যেমন সেই সুখটি ভোগ করিবার ইচ্ছা হয় অমনি তাহার উপকরণের চেষ্টা জন্মে। অতএব বিষয়-সুখাভিজ্ঞের যে পুনঃপুনঃ সুখভোগের ইচ্ছা হয়, ইচ্ছা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে লোভ জন্মে, তাহারই নাম রাগ। এই রাগ প্রবল থা-কিতে যোগী হইবার সাধ্য নাই। এই রাগ হইতেই দ্বেষের উৎপত্তি। দ্বেষ কি? তাহাও ব্যক্ত করিতেছি।

"দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ।"

দুঃখের অনুবৃত্তির নাম দ্বেষ। যে ব-স্তুতে যে আকারের দুঃখ অনুভব হইয়াছে সংস্কার বশতঃ জীবের সেই দুঃখ পুনশ্চ স্মরণাত্মক একবার অনুবৃত্তি হয়। যেমন দুঃখের স্মরণ হয় অমনি তাহা যাহাতে না হয় তাহারই চেষ্টা জন্মে। যে বস্তুতে দুঃখ হইয়াছিল সেই বস্তুর প্রতি যে প্রতি-ঘাত-চেষ্টা, ক্রোধ ও হিংসা জন্মে তাহা-রই নাম দ্বেষ। এই দ্বেষ জীবের দুঃখদায়ক এবং এই বদ্ধমূল রাগদ্বেষ হইতেই জীব-মাত্রের কি জ্ঞানী কি মূর্খ সকলের চিত্তেই এক প্রকার অভিনিবেশ বদ্ধমূল হইয়া আছে। অভিনিবেশ কি? তাহা বলা যা-ইতেছে।

"স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ।"

প্রাণিমাত্রেই শরীরের উপর অহং অ-র্থাৎ আমি এতদ্রূপ সম্পর্ক পাতাইয়া আছে। এই জন্য, প্রাণিমাত্রেই সম্পর্ক-পাতান দেহের জন্য একপ্রকার প্রার্থনা করিতেছে, তাহার একক্ষণের জন্যও বিরাম নাই। সে প্রার্থনা কি? না মরণ-ত্রাস—মরণ-দুঃখের অনুবৃত্তি-নিবারণ-প্রার্থনা "মা ন ভুবম্‌, ভুয়াসমেব।" কিসে আমি না মরিব, আমি যেন না মরি। তাহা এইরূপ প্রার্থনা। ইহারই নাম অভিনিবেশ এবং ইহাও দুঃখ মধ্যে গণ্য; যেহেতু ইহা থাকা-তেই জীবের অনেক প্রকার ক্লেশ সঞ্চার হই-

তেছে। এই অভিনিবেশ থাকাতেই জীব কার্য্য করিতে পারে না, সর্ব্বদাই "কিসে না মরিব" এই চেষ্টায় রত আছে।

পতঞ্জলি, এস্থলে একটি গূঢ় বিষয়ের উল্লেখ বা সঙ্কেত করিয়াছেন। সেটি কি? না পূর্ব্ব-জন্ম-সম্বন্ধ। পূর্ব্ব-জন্মের অনুভূত মরণ দুঃখ হইতেই ইহ জন্মে উল্লিখিত অভিনিবেশ জন্ম লাভ করিয়াছে। কে বলিল আবার পূর্ব্ব-জন্ম আছে? "এতয়া চ পূর্ব্বজন্মানুভবঃ প্রতীয়তে ন চ অননুভূত-মরণধর্ম্মকস্যৈষা ভবতি।" "আমি যেন না মরি—কিসে আমি মরণের হস্ত হইতে ত্রাণ পাইব" জীব যে অহরহই এই রূপ প্রার্থনা করে, কেন করে? এত মরণ-ত্রাস কেন? অবশ্যই ইহার কোন নিগূঢ় কারণ আছে। সে কারণ অন্য কোন রূপ হইতে পারে না; ভোগ করিয়াছে, আর ভোগ করিতে চাহে না, ইহাই তাহার কারণ।

পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, সুখ একবার অনুভূত হইলে পুনশ্চ তাহাতে ইচ্ছার উদ্রেক হইবে এবং দুঃখও একবার অনুভূত হইলে তাহার প্রতি অনন্ত কালের নিমিত্ত দ্বেষ হইবে। জীবের যখন মরণের প্রতি এত দ্বেষ তখন নিঃসংশয়িত অনুমান হইতেছে যে, জীব মরণে যে কি এক কঠোরতর দুঃখ আছে তাহা সে নিশ্চিত ভোগ করিয়াছে। মরণে যদি দুঃখ না থাকিত, আর জীব যদি তাহা ভোগ না করিত তাহা হইলে কখনই জীবের মরণের প্রতি এত দীর্ঘ দ্বেষ হইত না। এই দ্বেষ অত্যন্ত হীনচৈতন্য কৃমি কীট ও সদ্যোজাত দেহীদিগেরও আছে। লোকে বলে মনুষ্য আপন স্ত্রীর সমস্তই দেখিতে পায় কেবল একটি পা'য় না। কি? না বৈধব্য। মনুষ্য একবার বৈ দুবার মরে না, সুতরাং বুঝিতে হইবেক যে, জীবিত মনুষ্য ইহ শরীরে মরণ-দুঃখ অনুভব করে নাই। দেহান্তরে করিয়াছিল, বর্ত্তমান দেহে তাহারই অনুবৃত্তি আসিয়াছে। এই অনুবর্ত্তন স্বরসবাহী অর্থাৎ বাসনা বা সংস্কারের স্রোতে আসিয়া পড়ে অথবা স্বভাবের স্রোতে আসিয়া পড়ে বলিয়া জীব স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারে না যে, আমি একবার মরণ-দুঃখ ভোগ করিয়াছি।

ক্রমশঃ

ভারতবর্ষীয়দিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

(ভারতী হইতে উদ্ধৃত।)

পূর্ব্বসংখ্যায় ভারতীতে আমরা "বল যার অধিকার তার" এই নিয়মটির বিষয় আলোচনা করিয়াছি—এক্ষণে লেখক মহাশয় ভারতবর্ষীয়দিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ পক্ষে যে সকল অবশ্য-পালনীয় নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। তিনি বলেন—বাণিজ্য, শিল্প, রাজনৈতিক ভাব (Political spirit) ও বিজ্ঞান—এই গুলিই ভারতবর্ষীয়দিগের বিশেষ অভাব—রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের এই গুলিই মুখ্য নিয়ম ও সাধন—এই গুলিই আমাদের সকল রোগের মহৌষধি।

কিন্তু প্রথমেই এই প্রশ্ন উঠিতে পারে, ভারতবর্ষীয়দিগকে একটি সমগ্র জাতি বলা যায় কি না? ভারতবর্ষীয় বলিলে ভারতবর্ষবাসী মুসলমান ও খৃষ্টান পর্য্যন্ত তাহার অন্তর্ভুক্ত হয় কি না? যদি তাহাদিগকে ছাড়িয়া শুদ্ধ হিন্দুজাতিকেই ধরা যায়—তাহা হইলেও এক্ষণে হিন্দুগণের যে রূপ অবস্থা, তাহাদিগকে কি এক জাতি বলিয়া মনে হয়? যে জাতির মধ্যে একতাসূত্র নিবদ্ধ হইয়াছে—যাহারা সকলে এক ভাবে, এক উৎসাহে উত্তেজিত হয়—যে জাতির মধ্যে এক জনের বিপদ উপস্থিত হইলে সাধারণ-বিপদ বলিয়া সকলে মনে করে, সেই জাতির জাতীয়তার প্রকৃত পত্তন-ভূমি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিতে হইবে—যতক্ষণ তাহা না হইবে ততক্ষণ সে জাতি জাতি-নামের যোগ্য নহে। সমস্ত হিন্দুজাতির মধ্যে এখন একতা নাই—এখন হিন্দুজাতিকে একটি সমগ্র জাতি বলিয়াই যেন বোধ হয় না। লৌকিক আচার ব্যব-

হার ভাষা প্রভৃতিতে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশ প্রত্যেক প্রদেশ হইতে ভিন্ন। এক্ষণে পঞ্জাবি, হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী মান্দ্রাজি, মহারাষ্ট্রী প্রত্যেককেই এক একটি স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া বোধ হয়। যত দিন না এই বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে বিজাতীয় বৈষম্যগুলি দূরীকৃত হইয়া একতা-সূত্রে নিবদ্ধ হইবে, ততদিন আমরা স্বাধীনতার উপযুক্ত হইব না, স্বাধীনতার অধিকারী হইব না, ততদিন আমাদিগের স্বাধীনতার আশা দুরাশা মাত্র। এই একতার অভাবেই আমরা স্বাধীনতা হারাইয়াছি, এবং পৃথিবীর অনেক জাতিই এই একতার অভাবেই স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। অতএব সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে একতার অভাবই প্রধান অভাব। এই একতা-সাধন পক্ষে বিজ্ঞান শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি যে অতীব কার্য্যকারী তাহাতে সন্দেহ নাই—কোন জাতির মধ্যে বিজ্ঞান শিল্প বাণিজ্যের রীতিমত উৎকর্ষ সাধন হইলে, সে জাতির মধ্যে শুধু যে একতার সুবিধা হয় তাহা নহে, কিন্তু একত্র হইয়া সাধারণ স্বার্থ রক্ষার্থ কি করিয়া কার্য্য করিতে হয়, কি করিয়া কার্য্যে সফলতা লাভ করা যায়—তাহার যথার্থ উপায় অবলম্বন করিবারও ক্ষমতা জন্মে।

সহস্র বৎসর দাসত্ব-ভারে প্রপীড়িত হইয়া স্বাধীনতার স্বাভাবিক ভাব—স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি—স্বাভাবিক স্পৃহা আমরা হারাইয়াছি। আমরা হৃদয়ের দ্বারা এক্ষণে স্বাধীনতার আস্বাদ পাই না—এক্ষণে জ্ঞান দ্বারা স্বাধীনতার উপকারিতা ও আবশ্যকতা আমাদিগকে বুঝিতে হইতেছে। হৃদয়ের স্বাভাবিক উত্তেজনায় এক্ষণে আমরা একত্র হইতে পারি না—এক্ষণে জ্ঞান দ্বারা একতার উপকারিতা বুঝিয়া তবে আমাদিগকে ঐক্য-সাধনে চেষ্টা করিতে হয়। অতএব একতা-সাধন পক্ষে এক্ষণে জ্ঞানানুশীলন যে সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মনুষ্য-প্রকৃতিতে বুদ্ধির সহিত হৃদয়ের, জ্ঞানের সহিত ভাবের একটি স্বাভাবিক যোগ আছে। ইহারা পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করে। আমরা যদি প্রথমে জ্ঞানের কথায় কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হই—আর যদি পুনঃপুনঃ সেই কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে থাকি—ক্রমে তাহা আমাদিগের ভাবের সহিত মিশ্রিত, হৃদয়ের সহিত জড়িত হইয়া যায়—ইহাই মানব-প্রকৃতির নিয়ম। আমরা যদি এক্ষণে জ্ঞান দ্বারা একতার উপকারিতা বুঝিয়া তাহার সাধনায় প্রবৃত্ত হই—ক্রমে আমরা ভাব দ্বারা চালিত হইয়া একত্র হইতে সমর্থ হইব। আমরা ভাবের সহজ পথ হারাইয়াছি—এক্ষণে আমাদিগকে দুরূহ জ্ঞানের পথ দিয়া ভাবের পথে উপনীত হইতে হইব। সাধারণ জ্ঞানানুশীলন ও শিক্ষা এই জন্য নিতান্ত আবশ্যক। উচ্চতর বিজ্ঞান-চর্চ্চাও যে একতা-সাধনের বিলক্ষণ সহায়তা করে, বিজ্ঞান-প্রসূত বাষ্পীয় শকট, তাড়িত-বার্ত্তাবহ প্রভৃতি তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। তাহাদিগের সাহায্যে ভারতবর্ষের দূরবর্ত্তী প্রদেশ সকলের মধ্যে পরস্পর যাতায়াত কেমন সহজ হইয়া পড়িয়াছে—বাণিজ্য-ব্যাপারের কেমন সুগমতা হইয়াছে—এইরূপে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশীয় জাতিদিগের মধ্যে দ্রব্যের বিনিময় ও ভাবের বিনিময় দ্বারা একতার পথ কেমন অল্পে অল্পে উন্মুক্ত হইতেছে। তবে, এই সকল বাষ্পীয় শকট, তাড়িত-বার্ত্তাবহ প্রভৃতি যদি আবার আমাদিগের স্বজাতীয় বিজ্ঞান চর্চ্চার ফল হইত—যদি স্বজাতীয় ধনে ও স্বজাতীয় চেষ্টায় ঐ সকল ব্যাপার আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত হইত, তাহা হইলে আর আমাদের সুখের সীমা থাকিত না—তাহা হইলে আমাদের উদ্দেশ্য আরও সফল হইত—দেশের শ্রী সৌভাগ্য আরও বর্দ্ধিত হইত—ভারতবর্ষের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইত। এক্ষণে "পর-দীপ-মালা নগরে নগরে, তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।" অতএব বিজ্ঞান-চর্চ্চা যে জাতীয় উন্নতির প্রধান সোপান ও রাজ-নৈতিক স্বাধীনতা লাভের বিশিষ্ট উপায় তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই একতা-সাধনের পক্ষে আমাদের দেশে অনেক গুলি বাধা আছে এবং আরও নূতন নূতন বাধা উপস্থিত হইতেছে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দুগণের মধ্যে অন্য বিষয়ে যতই কেন বিভিন্নতা থাকুক না, তাহাদিগের ধর্ম্ম এক ছিল। হিন্দুধর্ম্ম হইতে নানা সম্প্রদায় উত্থিত হইয়াছিল বটে—কিন্তু সে সমুদায় হিন্দুধর্ম্মের শাখাপ্রশাখা বলিয়া পরিগণিত। বৌদ্ধধর্ম্ম যদিও হিন্দুধর্ম্ম হইতে প্রসূত, তথাপি হিন্দুধর্ম্মের অব্যবহিত অধীনতা স্বীকার না করায় উহা ভারতবর্ষে বহুদিন তিষ্ঠিতে পারে নাই। আমাদিগের সনাতন ধর্ম্মদর্পণে যে উপধর্ম্মমলা পড়িয়াছে, তাহা মার্জ্জিত করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের বিশুদ্ধতা সম্পাদন কর তাহাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু নিরর্থক কোন নূতন ধর্ম্ম আনিয়া একতার বিঘ্ন সাধন করা স্বদেশবৎসলদিগের পক্ষে যুক্তিসিদ্ধ নহে। সেই জন্য এক্ষণে যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে একটি নূতন বিজাতীয় ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত সন্দেহ নাই। ভাষার বিভিন্নতা আর একটি একতার ব্যাঘাত—কিন্তু ইহাকে আমরা তত গুরুতর বলিয়া মনে করি না—কেন না, হিন্দুস্থানী

ভাষা ব্যবহারতঃ সমস্ত ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা হইয়া পড়িয়াছে। কি বাঙ্গালী—কি বোম্বাইবাসী—কি মান্দ্রাজি—প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাষা থাকিলেও সাধারণ হিন্দুস্থানী ভাষায় ইহাঁদের পরস্পরের মধ্যে অনায়াসে কথোপকথন চলিতে পারে। তবে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে সাধারণের মধ্যে হিন্দুস্থানী ভাষার যাহাতে আরও অধিক চালনা ও শিক্ষা হয় তৎপ্রতি দেশহিতৈষী মাত্রেরই যত্ন করা বিশেষ আবশ্যক। এক কথায়—আচার ব্যবহারে, ভাবে, ধর্ম্মে, জ্ঞানে যতই ভারতবর্ষ একতার দিকে অগ্রসর হইবে, ততই হিন্দুগণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত হইবে।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পক্ষে আমাদিগের দুই প্রকার অভাব আছে। সমস্ত ভারতবর্ষের সাধারণ অভাব এবং ভারতবর্ষের অভ্যন্তরস্থ প্রত্যেক প্রদেশের বিশেষ বিশেষ অভাব। সমস্ত ভারতবর্ষের সাধারণ অভাবের মধ্যে একতার অভাব দেদীপ্যমান—এবং বিজ্ঞান ধর্ম্ম শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি এই একতা-সম্পাদনের বিশিষ্ট উপায়—সুতরাং এ সকলও সমস্ত ভারতবর্ষের সাধারণ অভাবের মধ্যে ধর্ত্তব্য—এবং এই সকল অভাব মোচনার্থ ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশকেই সাধারণরূপে মনোযোগ দিতে হইবে—কিন্তু এই সাধারণ অভাব ব্যতীত প্রত্যেক প্রদেশের আবার বিশেষ বিশেষ অভাব আছে—যে প্রদেশের যে বিশেষ অভাব তৎ-মোচনার্থ সেই প্রদেশবাসীদিগের বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ আবশ্যক। পঞ্জাবীদিগের শরীরে বল আছে, মনের তেজ আছে—হয়তো জ্ঞানের অভাবই তাহাদিগের মুখ্য অভাব। বোম্বাইবাসীদিগের মধ্যে বাণিজ্য-ব্যবসায়ের তেমন অভাব নাই—হয়তো মানসিক তেজের অভাব। হিন্দুস্থানীদিগের শারীরিক বলের অভাব নাই, হয়তো বুদ্ধির অভাব। বাঙ্গালীদিগের বুদ্ধির অভাব নাই—তাহাদিগের শারীরিক বল সাহস ও একতার নিতান্ত অভাব। এইরূপ প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অভাব, এবং এই সকল অভাব মোচনার্থ প্রত্যেক জাতির বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ আবশ্যক। অন্যান্য প্রদেশের কি কি বিশেষ অভাব তাহা আমরা নিশ্চয় রূপে অবগত নহি—বঙ্গদেশের যে বিশেষ অভাব, প্রথমে তাহার আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইব। এক্ষণে শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের মনে স্বাধীনতা-স্পৃহা বলবতী হইয়াছে—এই স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত হইবার জন্য প্রথমেই কি আবশ্যক? অন্য ভারতবাসীদিগের পক্ষে যাহাই হউক, বাঙ্গালীদিগের মুখ্য ও বিশেষ অভাব কি? রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের মুখ্য ও প্রথম সাধন কি?

কে না জানে, বাঙ্গালীজাতি শরীরের দুর্ব্বলতা ও ভীরুতার জন্য জগদ্বিখ্যাত। শারীরিক দুর্ব্বলতা ও ভীরুতাই বাঙ্গালি জাতির কলঙ্ক। এবং শারীরিক দুর্ব্বলতা হইতে চরিত্রের আর যে সকল দোষ স্বভাবতই প্রসূত হইতে পারে, তাহার সমস্তই বাঙ্গালী জাতিতে বর্ত্তিয়াছে। আলস্য, জড়তা, নিরুৎসাহ, অনুদারতা, ক্ষুদ্রতা, বৃথা-অভিমান প্রভৃতি শারীরিক দুর্ব্বলতার যে সকল অবশ্যম্ভাবী ফল, তাহা বাঙ্গালী জাতির মধ্যে বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়। অতএব এই অভাবটি যত দিন না মোচন হইবে তত দিন বাঙ্গালী জাতির কোন আশা নাই। এই অভাব মোচন না হইলে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া বিজ্ঞান-চর্চ্চাই হউক—বাণিজ্য শিল্পের অনুশীলনই হউক বা রাজনৈতিক উদ্যমের পরিচয় দিয়া (Political spirit) সভায় বক্তৃতারই ধূমধাম হউক, বাঙ্গালীর প্রকৃত অভাব কিছুতেই ঘুচিবে না—তাহারা কখনই প্রবল জাতিদিগের মধ্যে গণ্য হইবে না—তাহারা কখনই রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত হইবে না। এক্ষণে শারীরিক উন্নতির উপর আমাদিগের সকল উন্নতি নির্ভর করিতেছে। শরীর দুর্ব্বল হইলে—কি বিজ্ঞান, কি বাণিজ্য, কিছুতেই সম্যক্‌রূপে উৎকর্ষ লাভ করা যায় না। মাড়োয়ারিয়া বাণিজ্য-ব্যাপারে যেরূপ শারীরিক কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করে, তাহা কি দুর্ব্বল বাঙ্গালীর সাধ্য?—সাধ্য নাই বলিয়া কেঁয়ে মাড়োয়ারিরা বাঙ্গালার সকল বিপণীতেই বাণিজ্য-ব্যাপারে বাঙ্গালীদিগকে অতিক্রম করিয়া তাহাদিগের স্থান ক্রমে ক্রমে অধিকার করিতেছে। বিজ্ঞানের কথা যদি বল—এত দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তো বিজ্ঞানের আলোচনা হইতেছে—কৈ তাহা হইতে স্থায়ী ফল কি ফলিয়াছে? স্থায়ী ফল ফলিতেছে না কেন, তাহার কারণ কোন পূর্ব্ব সংখ্যার ভারতীতে যেরূপ চিত্রবৎ বিবৃত হইয়াছে, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে। "খর্ব্বকায় রুগ্ন শীর্ণ কতকগুলি লোকের কাছে কত দূর আশা করা যায়? শারীরিক বলের অভাবে তাহাদের মনের মহত্ব জন্মিবে কোথা হইতে? তাহারা অত্যাচারে, অভাবে, শিশু ও অবলার ন্যায় ক্রন্দন করিতে পারে, পুরুষের মত, বীরের মত অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অভাবের বিরুদ্ধে, যুদ্ধ করিতে পারে না। আধ ঘণ্টা কঠিন বিষয় চিন্তা করিলে মাথা ঘুরিয়া যাইবে, দুই চারিটি চিন্তা-সাধ্য পুস্তক লিখিলে মাথার পীড়া হইবে। তবে এখন নূতন বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করিবে কি করিয়া? যাঁহারা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত, তাঁহারা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানান্বেষণে ব্যস্ত থাকেন, কত রাত্রি নিদ্রাহীন নেত্রে তারকার দিকে চাহিয়া থাকেন, কত দিবস আহার ত্যাগ করিয়া সূর্য্যগ্রহণের প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। এ সকল কি আমাদের দৃষ্টি-অভাবে চসমা-চক্ষু, রাত্রি জাগরণে অজীর্ণরোগী, বিশ্রাম-অভাবে রুগ্ন দেহ, বায়ুর দোষে শীর্ণ-ধাতু বি এ এমের কর্ম্ম?"—যদি তর্কের খাতিরেও আপাতত স্বীকার করা যায় যে, জ্ঞানানুশীলন শারীরিক বলের উপর নির্ভর করে না, তথাপি ইহা কে স্বীকার করিবে যে বিনা শারীরিক বলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জিত বা রক্ষিত হইতে পারে? রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ পক্ষে বাহুবল অর্জ্জনই প্রথম সাধন। শারীরিক বলই রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রথম পত্তন-ভূমি। তবে, বাহুবল ও জ্ঞানবলের মধ্যে জ্ঞানবল যে উৎকৃষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। কেন না, বাহুবলের সীমা আছে, জ্ঞানবলের সীমা নাই। এখনকার যুদ্ধ-বিগ্রহে বাহুবলের অপেক্ষা জ্ঞানবলের উপরেই অনেকটা জয়-পরাজয়

নির্ভর করে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া এক্ষণে বাহুবলের প্রয়োজন যে একেবারে চলিয়া গিয়াছে তাহা নহে—বরং দুই পক্ষের মধ্যেই যদি জ্ঞানবল সমান থাকে—এবং উহার এক পক্ষে বাহুবলের আধিক্য থাকে, তাহা হইলে সে স্থলে যে পক্ষে বাহুবলের আধিক্য, সে পক্ষ যে জয় লাভ করিবে তাহা এক প্রকার নিশ্চয় রূপে বলা যাইতে পারে। অতএব বিজ্ঞান-অনুশীলনই কি বাঙ্গালির পক্ষে যথেষ্ট?—বিজ্ঞান হইতে আমরা বন্দুক লাভ করিতে পারি বটে, কিন্তু সেই বন্দুক ঘাড়ে করিয়া ১০। ২০ ক্রোশ অবিশ্রান্ত অগ্রসর হইয়া ভীষণ বিপক্ষ সৈন্যের সম্মুখবর্ত্তী হওয়া কি শারীরিক বল ও সাহসের কর্ম্ম নহে? লেখক মহাশয় তো এক স্থলে আপনিই বলিয়াছেন যে—"Nay history proves more—It proves that even if the conquering race occupy an inferior scale of civilization,even if it be destitute of those arts and sciences which are generally recognized as the inevitable concommitants of a civilized life and have no other qualities to recommend itself but manly courage, abounding energy and undisguised frankness, its hammering down the totteriug remnants of a highly civilized but exceedingly corrupt nation is of rare service to humanity as a whole. It is hardly necessary to allude to those whom we mean. We mean of course the Franks, the Goths and the Vandals." অতএব তিনি এই স্থলে আপনিই প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পক্ষে বিজ্ঞান শিল্পই মুখ্য সাধন নহে—এবং ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য স্থল। কিন্তু তিনি আর এক স্থলে বিজ্ঞানকে স্বাধীনতা লাভের মুখ্য সাধন বলিতেছেন—"Thus science—that which our present wise and benevolent Ruler has already proposed seems to be the chief remedy —yea the panacea to say to all the frightful maladies which our dear country is so intensely suffering from. Following his advice, let us direct our efforts to a thorough cultivation and as much as possible to a wide diffusion of Science. It is Science, it is 'Culture' in the German sense of that word that should now engage our best energies, inorder that we may in due time reap its golden fruits which are:—National Prosperity, National Liberty, and as the full mature outcome of all, a free vigorous and noble National Literature." অতএব উদ্ধৃত দুই স্থল যে পরস্পর বিরোধী তাহা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হইতেছে। এবং লেখক মহাশয় রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের যে সকল উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে শারীরিক বল ও সাহস এবং ধৈর্য্য বীর্য্য প্রভৃতি বীরধর্ম্মকে একেবারেই ধরেন নাই বলিয়াই এই বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। আমরা বলি—সভ্যতার বর্ত্তমান অবস্থায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ পক্ষে বিজ্ঞান ও বাহুবল উভয়ই আবশ্যক। ফ্রাঙ্ক, ভাণ্ডাল, গথ প্রভৃতি বিজ্ঞান-শিল্প-বিহীন অসভ্যেরা যদি কেবল পৌরুষ, সাহস, অপরিমিত উদ্যম এবং অপ্রচ্ছন্ন সরলতার বলে জগদ্বিজয়ী রোমকদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, তবে বাঙ্গালিজাতির রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য কি বিজ্ঞান শিল্পই বিশিষ্ট উপায়—মুখ্য সাধন—সকল রোগের মহৌষধি? যদি জগদ্বিজয়ী রোমকদিগের স্বাধীনতা রক্ষার পক্ষে পৌরুষ সাহস প্রভৃতিই নিতান্ত আবশ্যক হয় এবং সেই সকল গুণের অভাবই তাহাদিগের পতনের কারণ হয়, তাহা হইলে চির দাসত্ব-পীড়িত হীনবল ভীরু বাঙ্গালি জাতির পক্ষে কি ঐ সকল গুণের অর্জ্জন চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে আরও প্রয়োজন নহে? বিজ্ঞান শিল্প বাণিজ্যকে আমরা অনাদর করিতে বলিতেছি না—অনাদর করা দূরে থাকুক, বিজ্ঞান শিল্প বাণিজ্যকে আমাদের সভ্যতা ও উন্নতির প্রধান সোপান বলিয়া মনে করি। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই, কেবল মাত্র বিজ্ঞান শিল্প বাণিজ্যের বলে কোন জাতি এপর্য্যন্ত স্বকীয় রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই।

স্বাধীনতা লাভের পক্ষে এখন শারীরিক বল ও সাহসের নিতান্ত প্রয়োজন। লেখক মহাশয় লর্ড লিটনকে এই জন্য সাধুবাদ দিয়াছেন যে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণের দিন এই মর্ম্মে বক্তৃতা করেন যে, হিন্দুদিগের শিক্ষা ও উন্নতির পক্ষে বিজ্ঞান যেমন উপকারী, এমন আর কিছুই নহে। কিন্তু আমরা বলি, লর্ড লিটন মুখে মাত্র এই বক্তৃতা করিয়া যত না আমাদিগের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন, তদপেক্ষা আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব লেফ্‌টেনেণ্ট গভর্ণর ক্যাম্বেল সাহেব বিদ্যার্থীদিগের জন্য ব্যায়ামচর্চ্চা ও কর্ম্মার্থীদিগের জন্য অশ্বারোহণ শিক্ষার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া আমাদিগের অধিক কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ নাই। এক্ষণে জ্ঞানানুশীলনে যেরূপ সকলে মনোযোগী হইতেছেন, শারীরিক বল, সাহস, উদ্যম, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা প্রভৃতি পুরুষোচিত গুণসকল যে উপায়ে বাঙ্গালিরা অর্জ্জন করিতে পারে, তাহারও প্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়া শিক্ষিত বঙ্গবাসী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ধৈর্য্য বীর্য্য দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণসকল যে অনেক পরিমাণে শারীরিক বলের উপর নির্ভর করে তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। যদিও কেবল সুশিক্ষার প্রভাবেই অনেক সময় আমাদিগের কর্ত্তব্য-বোধ ও অন্যান্য উচ্চতর স্পৃহা মনে উদ্বোধিত হইয়া আমাদিগকে পুরুষোচিত মহৎকার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে শারীরিক বল আমাদিগের সহায় না থাকিলে আমরা সেই সকল কার্য্যে আশানুরূপ ফল লাভে সমর্থ হই না, আমাদিগের উচ্চ স্পৃহা সকলকে কার্য্যে সমক্‌রূপে পরিণত করিতে পারি না। শিক্ষিত বঙ্গবাসীগণ অনেক সময় "বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া" করিয়া জগতের সমক্ষে যে হাস্যাস্পদ হয়েন তাহার

কারণ কি ?—কারণ আর কিছুই নহে—শিক্ষার প্রভাবে আমাদিগের মনে নানা প্রকার উচ্চ স্পৃহা উদিত হয়—কর্ত্তব্য-বুদ্ধি দ্বারা উৎসাহিত হইয়া সেই সকল স্পৃহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আমরা অনেক বৃহৎ বৃহৎ অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করি কিন্তু কার্য্যকালে আমাদের স্বাভাবিক দৈহিক দুর্ব্বলতা-প্রসূত জড়তা আসিয়া আমাদিগকে সেই সকল অনুষ্ঠান সমাপ্ত করিতে দেয় না কিম্বা সমাপ্ত হইলেও তাহাদিগকে স্থায়ী করিতে দেয় না।

এক্ষণে বঙ্গবাসীগণ কি উপায়ে শারীরিক বল ও সাহস সঞ্চয় করিবেন ভাবিতে গেলে নিরাশ হইতে হয়। আমাদের দেশের জল বায়ু, ভূমি ও ভৌগোলিক সংস্থান সকলই শারীরিক বলের বিরোধী—মনটেস্‌ক্ হইতে আরম্ভ করিয়া বকল ও টেন পর্য্যন্ত সকলেই জাতীয় চরিত্রের উপর বাহ্য প্রকৃতির কত দূর প্রভাব তাহার ব্যাখ্যা করিয়া আসিয়াছেন—এই বাহ্য প্রকৃতির প্রভাব ভাবিতে গেলে বাঙ্গালীরা যে কোন কালে বীর-জাতি হইবে এরূপ আশা মন হইতে একেবারে দূর করিতে হয়। কিন্তু বাহ্য প্রকৃতিকেও জয় করিতে পারে এরূপ আর একটি প্রবলতর শক্তি মনুষ্যের অন্তরে নিহিত আছে—সেটি মনের শক্তি—ইচ্ছার শক্তি—অধ্যবসায়ের শক্তি—এই শক্তির প্রভাবেই মনুষ্যগণ বাহ্য প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতের কঠোর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া তাহার মধ্যেও সুন্দর পুরী নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে—নীরস মরুভূমিকেও প্রফুল্ল উদ্যানে পরিণত করিতে পারিয়াছে—অপার সাগরকেও আয়ত্তের মধ্যে আনিতে সক্ষম হইয়াছে। আমরা যখন জ্ঞান দ্বারা বুঝিয়াছি যে, শরীরের দুর্ব্বলতাই আমাদিগের জাতীয় অবনতির প্রধান কারণ—তখন যদি আমরা ইচ্ছাকে বলবতী করিয়া অধ্যবসায়সহকারে—যে সকল সামাজিক প্রথা আমাদের শরীরের বল-নাশক, সেই সকল সামাজিক প্রথাকে উন্মূলিত করিয়া—স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন ও ব্যায়াম চর্চ্চা প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিয়া শারীরিক বলের সাধনা করি—তাহা হইলে কি আমরা জল বায়ু ভূমি প্রভৃতির প্রাকৃতিক প্রভাবকে কিয়ৎপরিমাণে অতিক্রম করিতে পারি না ?—বকল্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ জাতীয় চরিত্রের উপর জল বায়ুর প্রভাব যত দূর প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ততদূর বাস্তবিক কিনা তাহা অধুনাতন কোন কোন চিন্তাশীল লেখক সন্দেহ করিয়া থাকেন। বিখ্যাত লেখক Bagehot তাঁহার "Physics and Politics" গ্রন্থের ১৮৩ পৃষ্ঠায় বলেন, "Climate and physsical surroundings, in the largest sense, have unquestionably much influence; they are one factor in the cause, but they are not the only factor; for we find most dissimilar races of men living in the same climate, and affected by the same sarroundidgs; and we have every reason to believe that those unlike races have so lived as neighbours for ages." প্রসিদ্ধ জাতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত Wallace সাহেব বলেন Papuan ও Malay জাতি একই গ্রীষ্ম-প্রধান প্রদেশে যুগ-যুগান্তর হইতে পাশাপাশি রহিয়াছে অথচ তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রকার বিভিন্নতা বিদ্যমান। তাঁহার গবেষণায় আরও প্রকাশ পায় যে, জন্তুদিগের পক্ষেও প্রাকৃতিক অবস্থার প্রভাব, সকল স্থানে ও সকল অবস্থায় বলবৎ নহে। তিনি বলেন—"Borneo closely resembles New Guinea, not only in its vast size and freedom from volcanoes but in its variety of geological structure, its uniformity of climate, and the general aspect of the forest-vegetation that clothes its surface. The Moluccas are the counterpart of the Philipines in their volcanic structure. their extreme fortility, their luxuriant forests, and their frequent earthquaqes; and Bali, with the east end of Java, has a climate almost as arid as that of Timor. Yet between those corresponding groups of islands, constructed, as it were, after the same patern, subjected to the same climate, and bathed by the same oceans, there exists the greatest possible contrast, when we compare their animal production. Nowhere does the ancient doctrine—that difference or similarities in the various forms of life that inhabit different countries are due to corresponding physical differences or similarities themselves —meet with so direct and palpable a contradriction. Borneo and New Guinea, as alike physically as two distinct countries can be, are zoologically as wide as the poles asunder; while Australia with its dry winds, its open plains. its stony deserts and its temperable climate yet producess birds and quadrupeds which are closely related to those inhabiting the hot, damp, luxuriant forests whsch everywhere clothe the plains and mountains of New Guinea"—অতএব বাঙ্গালী যুবকগণ যদি অধ্যবসায়সহকারে ব্যায়াম-চর্চ্চা প্রভৃতি উপায়ের অনুসরণ করেন, তাহা হইলে কেনই বা না বাহ্য প্রকৃতির প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া শারীরিক বল-সঞ্চয়ে সমর্থ হইবেন ? কিন্তু এই প্রকার অধ্যবসায়ের পূর্ণ ফল যাঁহারা অচিরাৎ দেখিতে চাহেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই নিরাশ হইবেন —কেন না, যে নিয়মে আমরা পূর্ব্বপুরুষের দোষ-গুণের উত্তরাধিকারী হই, সেই কৌলিক নিয়মের প্রভাবে আমরা আমাদিগের অধ্যবসায় সত্বেও—পূর্ব্বপুরুষদিগের দুর্ব্বল শারীরিক গঠন ও প্রকৃতির উত্তরাধিকার হইতে একেবারেই অব্যাহতি পাইব না, পরন্তু ক্রমে ক্রমে ব্যক্তিগত চেষ্টা ও অধ্যবসায় কৌলিক অধিকারের প্রভাবকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে।

প্রত্যেক ব্যক্তি কিম্বা জাতির উন্নতির মূলে—এমন কি, সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রধানতঃ দুইটি মূল নিয়ম দৃষ্ট হয়। একটি কৌলিক গুণ-প্রবাহের নিয়ম (Principle of Heredity) আর একটি উপযোগিতার নিয়ম (Principle of Adaptibility.) এই দুইটি নিয়মই মনুষ্য-সমাজে একত্র কার্য্য করিতেছে। প্রথমোক্ত নিয়মটির প্রভাবে আমরা পূর্ব্বপুরুষদিগের দোষ-গুণের উত্তরাধিকারী হই, এবং শেষোক্ত নিয়মটির অনুযায়ী আমাদিগের নিজ চেষ্টায় আপনাদিগকে অবস্থা ও ঘটনার উপযোগী করিয়া লইতে সমর্থ হই। যাহা বরাবর হইয়া আসিয়াছে তাহাই রক্ষা করিবার জন্য এবং তাহারই স্থায়িত্ব সম্পাদনের জন্য একটি নিয়ম সতত চেষ্টা করে, অপর নিয়মটি দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে আমাদিগকে অবস্থা ও ঘটনার উপযোগী করিয়া অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তনের দিকে—উন্নতির দিকে লইয়া যায়—এক কথায় একটি রক্ষণশীল—আর একটি পরিবর্ত্তনশীল বা উন্নতিশীল। এই দুই নিয়মে সমাজের শ্রেণীগত সাদৃশ্য রক্ষিত হয় ও ব্যক্তিগত বিভিন্নতা সম্পাদিত হয়। নূতন নূতন ঘটনা ও অবস্থা-স্রোতে আমরা একেবারে ভাসিয়া না যাই, কৌলিক নিয়ম আসিয়া তাহার প্রতিরোধ চেষ্টা করে এবং কৌলিক নিয়মানুসারে যে দোষ-প্রবাহ বংশপরম্পরাক্রমে প্রবাহিত হইবার কথা, উপযোগিতার নিয়ম আসিয়া তাহার পরিশোধন চেষ্টা করে; এইরূপে এই দুই নিয়মের ঘাত-প্রতিঘাতে মনুষ্য-সমাজ উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

আমরা বাঙ্গালি জাতি যেমন একদিকে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট হইতে দয়া, ধর্ম্ম, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রভৃতি সদ্গুণের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি, সেইরূপ আর এক দিকে তাঁহাদিগের ভীরুতা, নির্ব্বীর্য্যতা প্রভৃতি দোষেরও উত্তরাধিকারী হইয়াছি। এইক্ষণে এই দোষগুলি আমাদিগের চরিত্র হইতে অপনীত করিবার জন্য বাহিরের ঘটনাবলী ও অবস্থা কতদূর অনুকূল ও উপযোগী দেখা আবশ্যক। বলিষ্ঠ সাহসী ইংরাজ-জাতির সংস্রব ও দৃষ্টান্ত একদিকে যেমন এই উদ্দেশ্য সাধন পক্ষে উপযোগী, সেইরূপ আর একদিকে ইংরাজি সভ্যতা তাহার প্রতিকূল কি না তাহা আমাদিগের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। Mill মিল তাঁহার সভ্যতা নামক প্রবন্ধে এই মর্ম্মে বলেন যে, ইংরাজি সভ্যতার প্রভাবে ইংরাজদিগের বীর্য্য দিন দিন হ্রাস হইতেছে। তিনি বলেন—"There has crept over the refined classes. over the whole class of gentlmen in England, a moral effemminacy, an inaptitude for every kind of struggle. They shrink from all effort, from every thing which is troublesome aud disagreeable. The same causes which render them sluggish and unenterprising, make them, it is true for the most part, stoical under inevitable evils. But heroism is an active. not a passive quality, and when it is necessary not to bear pain but to seek it, little needs pe expected from the men of the present day. They can not undergo labour, they can not brook ridicule, they can not brave evil tongues: They have not hardihood to say an unpleasant thing to any one whom they are in the habit of seeing, or to face even with a nation at their back, the coldness of some little coterie which surrounds them."

যদি বলিষ্ঠ ইংরাজজাতিকেও ইংরাজি সভ্যতা দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতে পারে, তাহা হইলে চির-দুর্ব্বল বাঙ্গালি জাতি তো উহার দ্বারা আরও দুর্ব্বল হইবার কথা। এখনও ইংরাজদিগের প্রকৃতিতে কুল-পরম্পরাগত এতখানি সার সঞ্চিত আছে, অ্যাঙ্গ্লোস্যাক্সন রক্তের এত অধিক তেজ আছে যে, তাহারই বলে তাহারা ইংরাজি সভ্যতার দৌর্ব্বল্যজনক প্রভাব কথঞ্চিৎ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালিজাতির সে সারও নাই, সে তেজও নাই, অথচ সেই ইংরাজি সভ্যতার সমস্ত ভার তাহাদিগের দুর্ব্বল স্কন্ধে চাপানো হইয়াছে। বাঙ্গালিজাতির পূর্ব্ব পরম্পরায় অর্জ্জিত অন্তরের সারবত্তা ও শারীরিক বল নাই বলিয়াই তাহারা কোনও বিদেশীয় জাতির প্রভাব এ পর্য্যন্ত অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। যখন মুসলমানদিগের আধিপত্য ছিল, তখন আমরা মুসলমানদিগের সভ্যতায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম, এক্ষণে আবার ইংরাজি সভ্যতায় সম্পূর্ণরূপে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। মুসলমানদিগের আমলে তাহাদিগের অনুকরণে চাপকান কাবা পরিয়াছিলাম, এক্ষণে আবার একেবারেই হ্যাট্ কোট্ পেণ্ট্‌লুন পরিতে আরম্ভ করিয়াছি।

কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, মুসলমানি সভ্যতা ইংরাজি সভ্যতা অপেক্ষা আরও দৌর্ব্বল্যজনক। মুসলমানদিগের তুলনায় ইংরাজের সংস্রব আমাদের পক্ষে যে অনেক উপকারী তাহাতে সন্দেহ নাই। মুসলমান সভ্যতার সহিত আলস্য ও বিলাসের মূর্ত্তিমান প্রতিরূপ-আতর গোলাব তাকিয়া গদি প্রভৃতি যেন একেবারে জড়িত, এবং ইংরাজি সভ্যতাগত বিলাস সামগ্রীর মধ্যেও অপেক্ষাকৃত কার্য্যতৎপরতা ও উদ্যমের ভাব লক্ষিত হয়। ইহা কে না স্বীকার করিবে যে, ইংরাজদিগের সংসর্গে, শিক্ষায় ও দৃষ্টান্তে আমাদিগের কার্য্য-তৎপরতা ও শ্রমশীলতা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু ইহা আমাদিগের স্বাভাবিক নহে, সুতরাং ইহার উপর নির্ভর করা যায় না। শারীরিক বল ও স্ফূর্ত্তি হইতে স্বাভাবিক ভাবে যে উদ্যম-তৎপরতা প্রসূত হয়, তাহাই অপেক্ষাকৃত অধিক ফলপ্রদ ও স্থায়ী। ইংরাজি সভ্যতার প্রভাবে আমাদের এত অভাব বৃদ্ধি হইয়াছে যে, আর অল্পে সন্তুষ্ট হইবার যো নাই। জীবিকার উপায় করিবার জন্য আকুল হইয়া সকলকে ইতস্ততঃ বেড়াইতে হইতেছে, এমন কি, উহার জন্য আমাদিগের যুবকদিগকে সাত সমুদ্র পার হইয়া দূর দেশে যাইতে হইতেছে। এত উদ্বেগ ও এত চিন্তা বাঙ্গালীর দুর্ব্বল

শরীরে কি সহ্য হইবে? এক্ষণে ইংরাজদিগের শাসনে আমাদিগের মধ্যে যেরূপ এক দিকে কার্য্য-তৎপরতা, উদ্যম ও স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তি হইতেছে—সেইরূপ আর এক দিকে আমাদিগের দৈহিক বল-সঞ্চয়ের প্রতি লোকের কি সেরূপ যত্ন ও মনোযোগ দেখা যায়? মুসলমানদিগের আমলে তেমন সুশাসন ছিল না—দস্যুদিগের প্রাদুর্ভাব ছিল, সুতরাং সকলকে দায়ে পড়িয়া শারীরিক বল ও সাহস অর্জ্জনের চেষ্টা করিতে হইত। তখন লেখা পড়ারও এত চাপ ছিল না, সুতরাং শরীরের প্রতি অনেকটা লোকের দৃষ্টি থাকিত। বিপদের সহিত সংগ্রাম না করিলে কখনই সাহস ও আত্ম-নির্ভরের শিক্ষা হয় না। কিন্তু এক্ষণে আমাদের বিপদের লেশমাত্র আশঙ্কা নাই। আমরা শান্তির ক্রোড়ে দিব্য আরামে শুইয়া আছি। রাজপুরুষদিগের উপর সমস্ত নির্ভর, আপনার উপর কিছুই নির্ভর করিতে হয় না। পুলিসের এমনি শাসন, জীবন সম্পত্তি রক্ষার জন্য আমাদিগের নিজের কোন চেষ্টা পাইতে হয় না। এই জন্য শারীরিক বল ও সাহস অর্জ্জনের নিমিত্ত আমাদিগের কোন প্রয়োজনই বোধ হয় না। তাতে আবার লেখা পড়ার এত চাপ যে, এতদ্দেশীয় যুবকেরা শরীরের প্রতি মনোযোগ দিতে অবকাশ পান না এবং রাজপুরুষদিগেরও সে দিকে দৃষ্টি নাই। আমরা এ কথা বলি না যে, অরাজকতা হউক, অশান্তি হউক, লেখা-পড়া দেশ হইতে উঠিয়া যাউক, কেবল শারীরিক বল অর্জ্জনে লোকের চেষ্টা হউক। তাহা আমাদিগের বলিবার অভিপ্রায় নহে। আমরা বিলক্ষণ জানি যে, জ্ঞান-বিরহিত শারীরিক বল পশুতেই শোভা পায়—তাহা মনুষ্যের উপযুক্ত নহে, এবং ইহাও বিলক্ষণ জানি যে, যদি কোন জনসমাজে অরাজকতা অশান্তি থাকে, জীবন-সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্তই সকলকে আকুল হইতে হয়, তাহা হইলে সে সমাজের অন্তর্ভূত কোন ব্যক্তি শিল্প বাণিজ্য বিজ্ঞান সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে না, সুতরাং সভ্যতা ও উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু আমাদিগের বলিবার অভিপ্রায় এই যে, যেহেতু আমাদিগের সমাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা শারীরিক বল ও সাহস অর্জ্জনের অনুকূল নহে, সেই জন্যই আরও দেশের লোক ও রাজ-পুরুষদিগের এই বিষয়ে অধিক মনোযোগী হওয়া উচিত। আমরা এক্ষণে যে শান্তি উপভোগ করিতেছি তাহা নির্জীবের শান্তি—তাহা মৃতদেহের শান্তি—তাহা বলবান জীবন্ত পুরুষের শান্তি নহে। শান্তিকে রক্ষা করিবার জন্যও বলের প্রয়োজন। যদি আমাদিগের নিজের বল না থাকে, তাহা হইলে শান্তি রক্ষার জন্য চিরকালই পরের উপর নির্ভর করিতে হইবে, যে শান্তি রক্ষার জন্য পরের উপর নির্ভর করিতে হয়, সে শান্তির স্থায়িত্ব কোথায়? আজ যদি ইংলণ্ড আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যান, আমাদিগের এতটুকুও কি বল-সঞ্চয় হইয়াছে যে, আমরা নিজ বলে আপনাদিগের মধ্যে শান্তি রক্ষা করিতে পারি? সত্য, ইংলণ্ডের প্রসাদে আমরা তাড়িত-বার্ত্তাবহ পাইয়াছি—বাষ্পীয় শকট পাইয়াছি, বাষ্পীয় আলোক লাভ করিয়াছি, কিন্তু ইংলণ্ড যদি আজ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যান—তা হইলে উহার অবশিষ্ট আর কি থাকে? তাড়িত বার্ত্তাবহ প্রভৃতি কি তড়িতের ন্যায় তিরোহিত হয় না? এবং বাষ্পীয় শকট প্রভৃতি কি বাষ্পের ন্যায় বায়ুতে বিলীন হইয়া যায় না? ইংলণ্ডের কামান বন্দুক বেয়নেট, শত্রুর আক্রমণ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে সত্য—কিন্তু ইংলণ্ড আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে কি আমরা শিশুর ন্যায় একেবারে অসহায় ও নিরুপায় হইয়া পড়ি না।

আমরা ইংলণ্ডের নিকট আর কিছুই চাহি না—আমাদিগের বাহ্য সুখ-সমৃদ্ধি হোক্ বা না হোক্ তাহাতে ক্ষতি নাই। তিনি যদি আমাদিগের মৃতবৎ নির্জীব দেহে এতটুকু বল-সঞ্চার করিতে পারেন যে আমরা আপনার উপর নির্ভর করিতে পারি—আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে পারি—আপনার উন্নতি আপনারাই সাধন করিতে পারি—তাহা হইলেই আমরা তাঁহার নিকট প্রকৃত উপকার লাভ করিব—এবং তজ্জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ হইব।—তিনি যদি আমাদিগের অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লন—তিনি যদি উপযুক্ত দেশীয় লোকদিগকে রাজ্যের উচ্চ পদে অভিষিক্ত করিতে কৃপণতা করেন—তিনি যদি ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে অনৈক্য-বীজ বপন করেন—তিনি যদি দেশীয় বাণিজ্যের প্রতি বিদ্বেষ কটাক্ষ নিক্ষেপ করেন—তিনি যদি দেশীয় সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করেন—তিনি যদি দেশীয়দিগকে পদে পদে অবিশ্বাস করেন—তিনি যদি আমাদিগকে চিরকাল শৈশব দশায় রাখিতে চেষ্টা করেন—তাহা হইলে আমরা কি কখন স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত হইতে পারি? স্বীকার করি আমাদিগের নিজের চেষ্টা, নিজের অধ্যবসায়ের উপর অনেকটা নিজের উন্নতি নির্ভর করে কিন্তু আমরা সহস্র বৎসরের অধীনতায় একেবারে চিররোগীর ন্যায় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি—আমাদিগের দুর্ব্বল চেষ্টায় কত দূর হইতে পারে? তাহাতে যদি আবার কোন উচ্চতর প্রভু-শক্তি আসিয়া আমাদিগের উন্নতির পথে সহায়তা করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাহাতে কণ্টক রোপণ করেন, তাহা হইলে কি আমরা এক পদও অগ্রসর হইতে পারি? লেখক মহাশয় এক স্থলে বলিয়াছেন "Do you think if we *deserve* libety, that is to say, if we have slowly but surely developed those conditions which alone entitle a nation to that grand golden privilege, England would be willtng to withhold us from it—England, the land of noble heroic patriots?"

লেখক মহাশয়ের ন্যায়, স্বাধীনতার জন্মভূমি ইংলণ্ডও অনেক সময়ে আমাদিগকে এই আশ্বাস দিয়া থাকেন যে, অগ্রে উপযুক্ত হও, তবে তোমাদিগকে আমি উচ্চ অধিকার প্রদান করিব—কিন্তু উপযুক্ত হইবার অবসর না দিলে কেহ কখন কি উপযুক্ত হইতে পারে?—পিতা যদি তাঁর দুর্ব্বল সন্তানকে অস্টে পৃষ্ঠে বন্ধন করিয়া রাখিয়া তাহাকে বলেন যে, অগ্রে তুমি

উপযুক্ত হও তবে তোমাকে আমি পদচারণা করিতে দিব—সে যেরূপ আশ্বাস-বাক্য ইহাও তদ্রূপ। শিশুকে পদচারণা শিক্ষা দিবার সময় শিশু পদে পদে স্খলিত-পদ হয়—কিন্তু এই রূপ পদস্খলনের ওজর করিয়া যদি তাহাকে বলা হয়—তোমার এখনও উপযুক্ত বল হয় নাই, যখন বল হইবে তখন পদচারণা করিও—এ যেরূপ কথা উহাও সেই রূপ। সমস্ত হিন্দুজাতি জেতৃজাতির ইচ্ছামাত্র ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে—লেখক মহাশয় এইরূপ বিভীষিকা দেখাইয়াছেন, কিন্তু চিরকাল শৈশব দশায় থাকা অপেক্ষা একেবারে পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হওযাই কি প্রার্থনীয় নহে?

ইংলণ্ডের একবার ভাবা উচিত, কি মহান ভার বিধাতা তাঁহার স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন—বিংশতি কোটি মানবের সুখ-শান্তি স্বাধীনতা তাঁহার উপর নির্ভর করিতেছে। তিনি প্রথমে জয় করিবার উদ্দেশে এখানে আসেন নাই—বাণিজ্যের জন্যই আসিয়াছিলেন—মুসলমানের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া আমরা তাঁহাকে আহ্বান করিয়া আনিয়া তাঁহার হস্তে আমাদিগের যথা-সর্ব্বস্ব সমর্পন করিয়াছি বলিলেও হয়। একবার তিনি স্মরণ করিয়া দেখুন, যে পলাশির যুদ্ধে সমস্ত ভারতবর্ষে তিনি প্রবেশ লাভ করিতে পারিলেন, সে যুদ্ধে কাহার সাহায্যে তিনি জয় লাভ করিলেন!—আমরা দাসত্ব অত্যাচারে প্রপীড়িত হইবার জন্য তাঁহাকে ডাকি নাই, দাসত্ব-অত্যাচার হইতে মুক্ত হইবার জনাই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলাম—এই মহৎ সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার জনাই বিধাতা ভারতবর্ষকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, অতএব ইংলণ্ড আমাদিগের মনে স্বাধীনতার স্পৃহা ও আশা উদ্দীপিত করিয়া যেন তাহা আবার কঠোর ফুৎকারে নির্ব্বাণ করিতে চেষ্টা না পান—এখন তিনি যেন না বলেন যে, অগ্রে উপযুক্ত হও, পরে তোমাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিব। তিনি আমাদিগকে অগ্রে স্বাধীনতার অবসর দিন—স্বাধীনতা-স্ফূর্ত্তির পরিসর দিন—স্বাধীনতার শিক্ষা দিন—তাহার পরে বলুন "অগ্রে স্বাধীনতার জন্য উপযুক্ত হও, পরে তাহার আকাঙ্ক্ষা করিও।"

ACT III OF 1872.

The *Tattwa Koumudi* and the *Brahmo Public Opinion* have replied to our article on this subject published in our issue for *Agrahayan* last. Our contemporaries contend that what is required by the Act to be done by the bride and the bridegroom before the Registrar is a simple declaration and not regular marriage. Granted. But the main argument remains unanswered that, when the marriage takes place in the solemn presence of God, it is unnecessary, nay sacrilegious, to bring in a human being to witness it *to secure its validity*. We are surprised to note that our God-fearing and God-honouring contemporaries do not perceive the above.

The *Tattwa Koumadi*, in one of its articles on the subject, says that the word "Brahmo" denotes a difference between Brahmos and Hindus. We maintain the very contrary. We urge that the word "Brahmo" denotes the Hindu character of Brahmoism and that the distinction which our friends make between Brahmos and Hindus vitally injures the cause of Brahmoism since it unnecessarily isolates Brahmoism from Hinduism and creates ill-feeling between Brahmos and Hindus whereas there is no necessity for such isolation and the creation of such ill feeling. There are two kinds of Hinduism, idolatrous Hinduism and non-idolatrous Hinduism. The latter is Brahmoism which, as inculcated by those old Theists, the ancient Rishis, has recently received certain modifications at the hands of Ram Mohun Roy and Debendra Nath Tagore. This is owing to its progressive character as Theism. The bride and the bridegrocm are required to say before the Registrar that they do not believe in Hinduism. They are thereby made to utter a falsehood since the very term "Brahmo" signifies they are Hindus and therefore believe in non-idolatrous Hinduism. Those, who do not believe that Brahmoism, in addition to its catholic character, is Hinduism, should renounce the name of Brahmo. Our contemporaries say that the word "Hinduism" in the Act means "popular Hinduism" but, according to the genius of the English language, it evidently means all kinds of Hinduism.

Our contemporaries charge us with having attempted to have the designation of the Bill which was at first named "the Brahmo Marriage Bill," changed. We were obliged to do so both on catholic and national grounds. The Theists of England and America do not come under the designation of Brahmos. The Brahmos of the Adi Brahmo Samaj maintain that Brahmos form a component part of the Hindu community and do not wish to be ticketted as Brahmos by having a different marriage law made for them. They observe the old marriage ritual, bereft of its idolatrous portions and accompanied by Brahmo prayers.

We are really sorry for our contemporaries and the members of the Samaj which they represent. By placing themselves under a Government Act in matter of marriage, they have subjected their vital interests to the whim and caprice of a foreign government. The permission for divorce which the Act grants is revolting to the national idea and is likely to slacken the marriage bond and introduce immorality among Brahmos.

নির্দ্ধারিত মূল্য।

ব্রহ্ম বিদ্যালয় ... ১
বেদান্ত প্রবেশ ১
স্মৃতি ১
বক্তৃতা কুসুমাঞ্জলি ... ১
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে? /০
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায় ৶০
গীতাঙ্কুর ... ... /০
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ ভাল বাঁধা ... ॥০
রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী ১ম হইতে
১০ম সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রতি সংখ্যা ॥০

A Discourse against Hero-making in religion	As	12
Science of Religion		4

---

২৫ টাকা কমিসন বাদে নির্দ্ধারিত মূল্য।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে) ১॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (ঐ ভাল বাঁধা) ১৸৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে) ... ... ২॥৶০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ... ।৶০
ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ ৵০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা প্রথম ভাগ ।৶০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ ॥/০
হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ... ।৶০
পৌত্তলিক প্রবোধ ... ৵০
গৃহকর্ম্ম ৵০

	As.	P.
Defence of Brahmoism and the Brahma Samaj	3	0
Brahmic Questions of the Day	4	6
Brahmic Advice, Caution and Help	2	3
Adi Brahma Samaj, its Views and Principles	1	6
Adi Brahma Samaj as a Church	2	3
A Reply to the Query: What is Brahmoism? ...	3	0
Theistic Toleration and Diffusion of Theism ...	0	9
Reply to Bishop Watson's Apology for the Bible ...	4	6

নির্দ্ধারিত অর্দ্ধ মূল্য।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ ।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—দ্বিতীয় প্রকরণ ।০
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ ।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক ভাব ৶০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে) ।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম ... ৶০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বিতীয় খণ্ড ... /০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম তাৎপর্য্য সহিত ।০
মাঘোৎসব ... ... ॥০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ... ৵০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ... ৵০
কাশীশ্বর মিত্রের বক্তৃতা ... ।০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ... ৵০
ভবানীপুর সাংবৎসরিক সমাজের বক্তৃতা (১০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ ॥০
তত্ত্ববিদ্যা দ্বিতীয় সংস্করণ ... ৸০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা প্রথম ভাগ ... ॥০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা দ্বিতীয় ভাগ ... ॥০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে ১
অধিকারতত্ত্ব ... ... ।০
হিন্দুধর্ম্মনীতি ... ... ॥০
ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা ... ... /১০
তত্ত্বপ্রকাশ ... ... /১০
ধর্ম্মতত্ত্বালোচনা ... ... /১৫
ব্রহ্মোপাসনা ... ... (১০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি ... ... (১০
ব্রহ্ম-স্তোত্র ... ... (১৫
ধর্ম্ম-শিক্ষা ... ... /০
প্রবচন সংগ্রহ ... (১৫
ব্রহ্ম-সঙ্গীত চতুর্থ ভাগ ... /০
ব্রহ্ম-সঙ্গীত পঞ্চম ভাগ ... /০
সঙ্গীত মুক্তাবলি ১।২ ভাগ একত্রে ৶০
সঙ্গীত মুক্তাবলি তৃতীয় ভাগ .. ৶০
কুমার শিক্ষা ৶০
প্রশ্নমঞ্জরী ... ... ।০
প্রভাত-কুসুম ৶১০
উদ্বোধনাঞ্জলি ... ... (১০
ধর্ম্ম দীক্ষা ... ... (১০
ব্রহ্মসাধন ... ... /০
ব্রহ্মজ্ঞান ... ... (১০
ব্রহ্মজ্ঞান সূত্র তাৎপর্য্য সহিত ... /১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব প্রথম খণ্ড ... (১৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব দ্বিতীয় খণ্ড ... /০
ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত জন সমাজের সম্বন্ধ (১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক প্রস্তাব (১০
উপদেশ ... ... (৫
দুর্গোৎসব ... ... (১০
পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত (১০
বর্ণমালা প্রথম সংখ্যা ... (৫
বর্ণমালা দ্বিতীয় সংখ্যা ... (১০

	Rs.	As,	P.
Ontology	1		
Hindoo Theism			6
Theist's Prayer Book ...			6
Signs of the Times ...			6
Vedantic Doctrines Vindicated		I	0
Doctrine of Christian Resurrection		1	0
Physiology of Idolatry		I	0
Miracles or the Weak Points of Revealed Religion		4	0

নির্দ্ধারিত সিকি মূল্য।

দশোপদেশ	⁄১০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত) ...	।০
অনুষ্ঠান পদ্ধতি	⁄০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	(১০

১৭৭০ শক অবধি ১৭৯৮ শক পর্য্যন্ত (১৭৭৪ ও ১৭৮১ শক বাদে) যে সকল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পুস্তকালয়ে উপস্থিত আছে, তৎসমুদায়ও অর্দ্ধমূল্যে অর্থাৎ প্রতি বৎসরের একত্র বাঁধান ২॥০ টাকার হিসাবে বিক্রয় হইবে।

নির্দ্ধারিত মূল্যের পুস্তক সকল অন্যূন দশ টাকার ক্রয় করিলে শতকরা ১২॥০ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া হইবে।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৭ ই মাঘ রবিবার দুই প্রহর তিন ঘণ্টার সময় আমাদিগের যোড়াসাঁকোস্থ ভবনে ব্রাহ্মসমাজ-সংস্থাপক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ একটি সভা হইবে। উক্ত সভার কার্য্য নিম্নলিখিত প্রণালীমত সম্পাদিত হইবে। ব্রাহ্ম মহাশয়গণ উক্ত সভায় আগমন করিয়া কার্য্য সুসম্পাদন করিবেন।

বিষয়	বক্তা
১। সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য বিষয়ে সংক্ষেপ বক্তৃতা	শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
২। রামমোহন রায়ের রচিত ব্রহ্ম সঙ্গীত।	
৩। রামমোহন রায়ের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণনা	শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
৪। রামমোহন রায়ের প্রশংসাসূচক সঙ্গীত।	
৫। রামমোহন রায় বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প	শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু ও শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র বসু।
৬। রামমোহন রায়ের রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত।	
৭। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে রামমোহন রায়ের বিষয়ে শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের বক্তৃতা পাঠ	শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ।
৮। রামমোহন রায়ের রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত।	

শেষে সকলে আদি ব্রাহ্মসমাজে গিয়া সমস্বরে ঈশ্বরবন্দনা করিবেন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আগামী ৭ই মাঘ রবিবার মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা উপলক্ষে তথায় তাঁহার প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তক গুলি নগদ মূল্যে বিক্রীত হইবে।

পুস্তকের নাম	মূল্য
রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী,১ম হইতে ১০ম সংখ্যা, প্রতি সংখ্যা	॥০
Hindu Theism	।০

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
পুস্তকরক্ষক, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ১১ই মাঘের উৎসবে অত্যন্ত জনতা ও লোকেরা মৃতকল্প হয়, তজ্জন্য ঐ দিবসে রাত্রিকালের উপাসনার সময় উপাসনা ক্ষেত্রের বসিবার স্থান লোকপূর্ণ হইলে প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।

আয় ব্যয়

শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ১৮০০ শক।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	১৪২৪
পূর্ব্বকার স্থিত ...	২৩৩॥৶০
সমষ্টি	১৬৫৭॥৶০
ব্যয়	১৫১২ ৶১৫
স্থিত	১৪৫ ।৶৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	১৯২
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৪৭২
পুস্তকালয়	৪৫ ।⁄১৫
যন্ত্রালয়	৬৪৪ ৸⁄১৫
গচ্ছিত	৬৮ ৸৶১০
সমষ্টি	১৪২৪

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	৩৮০। ৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৪৮৯
পুস্তকালয়	১২৭ ৸৶০
যন্ত্রালয়	৪৪৫ ৷⁄ ৫
গচ্ছিত	৬৯ ।⁄ ৫
সমষ্টি	১৫১২ ৶১৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩০
,, রমণীমোহন চৌধুরী রায়বাহাদুর ...	২৫
,, নীলকমল মুখোপাধ্যায় ...	১০
,, তারকনাথ দত্ত	১০
,, গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ...	৫
,, অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায় ...	৫
,, বৈকুণ্ঠনাথ সেন	২
,, হরকুমার সরকার	২
,, রাজনারায়ণ বসু	১
,, গুরুচরণ মিত্র	১
,, মৃত রামলাল গঙ্গোপাধ্যায় ...	৫৫
	১৪৬

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চৌধুরী রায়বাহাদুর ...	১০
,, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫
,, যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	২
	১৭

দানাধারে প্রাপ্ত	১৫।৶১৫
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	১৩॥ ৫
	১৯২

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।
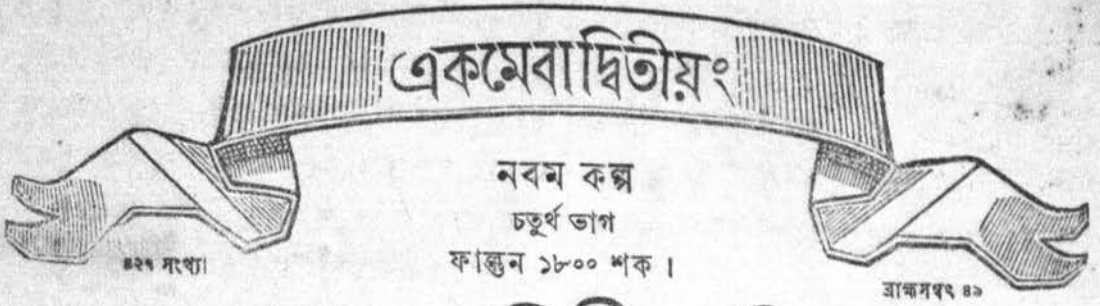
Registerd No 52.

নবম কল্প
চতুর্থ ভাগ
৪২৭ সংখ্যা। ফাল্গুন ১৮০০ শক। ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৯

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

একোনপঞ্চাশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ই মাঘ বৃহস্পতিবার ১৮০০ শক।

প্রাতঃকাল।

শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ির বক্তৃতা।

সেই এক সময়, যখন এই ভারতভূমি, বঙ্গভূমি ঘোর কুসংস্কার মোহ কাল্পনিক ধর্ম্ম ও পাপের ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। হা! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! যখন ধর্ম্মের নামে যার পর নাই নিষ্ঠুর ব্যাপার সকল অনুষ্ঠিত হইত, এক পবিত্র ধর্ম্মের অভাবে—ঈশ্বরের ধর্ম্মের অভাবে যখন চারি দিকে হাহাকার—গৃহস্থের গৃহ শ্মশান-সমান, সেই দুঃখের রজনী ভেদ করিয়া যে দিন ব্রাহ্মধর্ম্ম-রূপ তেজঃপুঞ্জ তপন বঙ্গভূমিতে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই দিন এগারই মাঘ। ইহারি নিমিত্ত এই দিন স্মরণীয়। ইহারি নিমিত্ত এই দিনের এত গৌরব। ইহারি নিমিত্ত এই দিন ব্রাহ্মমণ্ডলীর মহোৎসবের দিন।

এমন এক সময় ছিল, যখন নির্জ্জন-প্রিয় কৃতাত্মা ঋষি সকলই কেবল ব্রাহ্মধর্ম্ম-রূপ অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া জীবন সার্থক করিতেন, আর জন-সাধারণ কেবল বিষয়-কর্ম্মরূপ মৃত্যু-পাশেই বদ্ধ থাকিত। এই ১১ই মাঘেই মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, কৃপাময় পরমেশ্বরের প্রসাদে, এই জন-সম্বাধ মহানগরীর মধ্যে এই স্থানে সেই অমৃত ফলের বীজ রোপণ করেন, যাহা অ-ঙ্কুরিত হইয়া নয়নরঞ্জনকর শোভাময় বৃক্ষ-রূপে পরিণত হইয়াছে। ইহারি নিমিত্ত এই পবিত্র স্থান ও এই পবিত্র ১১ই মাঘ ঈশ্বরপরায়ণ মাত্রেরই হৃদয়-মন-প্রাণ আক-র্ষণ করে। এই আকর্ষণ স্বাভাবিক। সুত-রাং এই মহোৎসব স্বাভাবিক। কাহারও কল্পনা হইতে ইহা সমুত্থিত হয় নাই। ইহা সেই দেব-দেব কর্ত্তৃক প্রেরিত। তিনি এই উৎসবের প্রাণ। এই উৎসবে তাঁহার আবির্ভাব কেমন সুস্পষ্ট। আনন্দ মনে বিমল হৃদয়ে এই উৎসব-ক্ষেত্রে তাঁহাকে দর্শন করিব বলিয়া আমরা যেমন ব্যাকুল তিনিও তেমনি পরমাশ্চর্য্য অরূপ-রূপ প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে মোহিত করি-তেছেন। যাঁহার চক্ষু আছে তিনি তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। আর যিনি পাপরূপ

শলাকা দ্বারা বিশ্বাস-চক্ষু ভক্তি-চক্ষু নষ্ট করিয়াছেন—তিনি সে অরূপ-রূপ-মাধুরীর কথা কি বুঝিবেন।

হা! তিনি শিব সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য্যের সার। তাঁহার সৌন্দর্য্য আমাদের হৃদয়-প্রাণ-মনকে এপ্রকার অপ্রতিহত ভাবে আকর্ষণ করিতেছে যে আমরা এখন উদাস হইয়া আপনা হইতেই বলিতেছি, "তাঁর সমান কেহ চক্ষে দেখে নাই শুনে নাই শ্রবণে"। ব্রাহ্মগণ কি পবিত্র সময়। কোথা আমরা ক্ষুদ্র মলিন মানব, আর কোথা তিনি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরিশুদ্ধ। তিনি কৃপা করিয়া আমাদের হৃদয়কুটীরে উপস্থিত। ধন্য দেব! ধন্য তোমার করুণা! তোমার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া আমাদের আত্মা এখন উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে, "ডাকে একুটীরবাসী অতিশয় সযতনে, মুক্ত করি মলিন গৃহ অশ্রুবারি নিক্ষেপণে। তুমি আমার স্পর্শমণি, আঁধার ঘরের আলো, সুখশান্তি, সব তুমি শুভালোক এজীবনে"।

এই পবিত্র কালে আমরা এখন কোথায় রহিয়াছি। আমরা এখন ভূলোকেও নাই দ্যুলোকেও নাই। করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায়, এখন আমরা সেই পরম লোকেই অবস্থিতি করিতেছি।

পাপালাপ—পাপচিন্তা—পাপ-অনুষ্ঠান হইতে বিরত হইয়া—সংসার-আসক্তি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, এই পরম লোকে এই পরব্রহ্মে অবস্থিতি করাই আমাদের মহোৎসব। তাঁহার সহবাস-সুখে সংতৃপ্তি লাভ করিয়া তাঁহার যশোগান দ্বারা জীবনকে কৃতার্থ করাই আমাদের উৎসব।

পরব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎযোগই এই উৎসবের ভিত্তিভূমি। যিনি অতি সাবধানে তাঁহার সহিত যোগরক্ষা করেন, তিনিই কেবল এই উৎসব-বিনির্গত অমৃতরস পান করিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন। তাঁহার সহিত যোগরক্ষা করাই ব্রাহ্মজীবনের ব্রত।

এই যোগ কি প্রকারে সাধন করিতে হয়, তাহার কি উপদেশ চাই? কে শিশুকে তাহার মাতার নিকটে যাইয়া তাহার হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিতে শিক্ষা দিয়াছে? কে তাহাকে বলিয়া দিয়াছে যে তাহার জননীর ক্রোড়ই তাহার নিরাপদ দুর্গ ও শান্তিনিকেতন।

যদিও আমরা তাঁহার সকল স্বরূপ জ্ঞাত নহি, তাহাতে আমাদের ক্ষতি কি? ইহাত আমরা জানিতে পারিয়াছি, যে তিনি আছেন—সর্ব্বত্র আছেন এবং আমাদের অন্তরে আছেন, তিনি আমাদের জনক জননী, আর আমরা তাঁর—আদরের ধন—স্নেহের ধন সন্তান। আমরা যাহা করিতেছি তিনি তাহা দেখিতেছেন, আমরা যাহা বলিতেছি তিনি তাহা শ্রবণ করিতেছেন। তিনি আমাদের সকল শক্তির মূলে। এই জ্ঞান যাহার হৃদয়ে শয়নে স্বপ্নে দিনে নিশীথে পলকে পলকে জাগে, তিনিই ব্রহ্মযোগে যোগী। যিনি একবার তাঁহাকে আত্মস্থ করিয়া দেখিয়াছেন, যিনি তাঁহার মাতৃস্নেহ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার অবক্তব্য সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়াছেন, তিনি পুনঃপুনঃ তাঁহাতে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করেন। তিনি তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে চাহেন না এবং বিস্মৃত হইতেও পারেন না। যত তাঁহার যোগ বদ্ধমূল হয়, ততই তিনি দেখিতে পান, যে এক ঈশ্বরই আত্মোন্নতির মূল। যেমন লৌহ, চুম্বক-প্রস্তরে বারংবার ঘর্ষিত হইলে চুম্বক-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, তেমনি আত্মা পুনঃপুনঃ পরমাত্মায় সংঘর্ষিত হইলে দেব-ভাব প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ আনন্দস্বরূপ, সত্যস্বরূপ এবং অমৃতস্বরূপ। যিনি তাঁহার সহিত

সংযুক্ত হন, তাঁহারি আত্মা পাপ হইতে মুক্ত হয়—আনন্দ সুধারস পান করে—দুর্জ্জয় বল ধারণ করে—এবং মৃতু-ভয় ও মৃত্যু-যন্ত্রণাকে অতিক্রম করে।

এই যোগ জীবনে না থাকিলে জীবন প্রকৃতই মৃত্যু-সমান হইয়া উঠে। সেই ভারবহ জীবন যে কি ক্লেশাবহ তাহা তিনিই জানেন, যিনি তাঁহা হইতে বিচ্যুত হইয়া সংসার-যন্ত্রণা ও মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতে-ছেন। হে পরমেশ্বর! এ প্রকার দুর্গতি যেন কাহাকেও না ভোগ করিতে হয়।

আমাদের যে সকল ভ্রাতা এই দেব-দুর্ল্লভ উৎসবে বঞ্চিত, যাঁহারা অমৃতময় ঈশ্বরের সহিত যোগরক্ষা না করিয়া, মৃত্যু-রূপ সংসারের সহিতই কেবল যোগরক্ষা করেন—আমি তাঁহাদের জন্য,হে পরমেশ্বর! তোমার নিকট প্রার্থনা করি, যে তুমি তাঁহা-দিগকে তোমার সেই তুলনারহিত সৌন্দর্য্য দ্বারা আকর্ষণ করিয়া—তোমার মুক্তিপ্রদ উপাসনায় নিযুক্ত কর—কি প্রকারে তোমার সহিত যোগরক্ষা করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দেও, তাহা হইলেই তাহারা ব্রহ্মোৎসব-বিনির্গত অমৃতরস পান করিয়া চরিতার্থ হইবে, এবং আমাদেরও মনোরথ পূর্ণ হইবে।

অখিল জগতের জনক জননি! আমাদের এ ক্ষুদ্র রসনা তোমার করুণার কি পরিচয় দিবে। আমাদের মত ক্ষুদ্র পাপ-তাপে মলিন কীট যে তোমার প্রেরিত উৎসব-বিনির্গত সুধারস পান করিতেছে, ইহা স্মরণ মাত্রেই শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে। মনে যে কি ভাব উদয় হইতেছে তাহা অবক্তব্য। এই যে আমরা সকলে একহৃদয় হইয়া ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতেছি—এই যে তুমি স্নেহময়ী মাতা হইয়া আমাদিগকে তোমার অমৃতময় ক্রোড়ে স্থান দিয়া অমৃতরস পান করাইতেছ, ইহাতে তোমার বাৎসল্য ও কৃপা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না।

স্নেহময়ী জননি! তোমার সর্ব্বত্র-প্রসারিত অনন্ত ক্রোড় কি সুধাময়! কি মধুময়! মাতঃ! চির দিন ঐ ক্রোড়ে স্থান দাও। সকল প্রকার জ্বালা-যন্ত্রণা ও ভয় হইতে বিমুক্ত হই। মরণের সময় যখন শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইব, তখন যেন মনে এই ভাব জাগে যে আমি আমার স্নেহময়ী জননীর ক্রোড়ে নির্ভয়ে নিদ্রা যাইতেছি। পরলোকে আবার তাঁহারি ক্রোড়ে যাইয়া জাগ্রত হইব। জননি! তুমি সহায় জীবনে—তুমি সহায় মরণে—তুমি সহায় ইহলোকে—তুমি সহায় পরলোকে। তুমি আত্মার পরম আনন্দ!

সে কি মহোৎসবের দিন যখন আমরা তাঁহার প্রসাদে দেবলোকে যাইয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রেমময়ের প্রেম গান করিব। অদ্যকার এই উৎসব সেই মহোৎসবের পূর্ব্বাভাসমাত্র। তথাপি এই উৎসবের গৌরব ও আনন্দ আমরা কি হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি? কি পবিত্র আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। এস ব্রাহ্মগণ! এমন পবিত্র সময়ে আমরা আপনাপন আত্মাকে এই স্বর্গের বারিতে নির্ম্মল করি এবং শান্ত ও সমাহিত হইয়া ঈশ্বরের পবিত্র চরণ পূজা করিয়া মনুষ্য জন্ম সার্থক করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা।

মনুষ্য শরীর মন আত্মার সমষ্টি। মনু-ষ্যের শরীর লইয়া কেবল গণনা করিতে গেলে, সে জড়ের মধ্যেই পরিগণিত হয়। তাহার শরীর ও মনই সর্ব্বস্ব বলিতে গেলে, তাহাকে পশু অপেক্ষা আর বড় উচ্চ শ্রে-ণীতে স্থান-দান করা যায় না। তাহার আ-

ত্মার প্রতি দৃষ্টি করিলেই অতি সহজে জানা যায়, যে মনুষ্য অপেক্ষা আর উচ্চতর জীব ভূমণ্ডলে বর্ত্তমান নাই। মনুষ্যই জীব-রাজ্যের রাজা, মনুষ্যই মর্ত্ত্য লোকের অলঙ্কার। মনুষ্য, জড় উদ্ভিদের সঙ্গে, পশু পক্ষীর সঙ্গে একত্রে বাস করিলেও, তাহার আশা অধিকার উচ্চতর; তাহার জ্ঞান প্রেম মহত্তর, তাহার ক্রিয়াকাণ্ড মধুরতর। জড় উদ্ভিদের ন্যায় সে অচল নহে, পশু পক্ষীর ন্যায় তাহার আত্মসুখই সর্ব্বস্ব নহে। জগতের কল্যাণ সাধন, স্বীয় স্রষ্টা পাতা বিধাতার লক্ষ্য সম্পাদন করাই তাহার জীবনের সারতম কার্য্য। সেই লক্ষ্য সাধনের জন্যই তাহার সম্মুখে এই বিশাল কর্ম্ম-ক্ষেত্র প্রসারিত রহিয়াছে; সেই পবিত্র কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্তই তাহার শরীর মন আত্মাতে দেবদত্ত দুর্লভ উপকরণ সকল প্রদত্ত হইয়াছে। সুগভীর সাগর-গর্ব্ভে যেমন লক্ষ লক্ষ প্রবাল-কীট একত্রিত হইয়া, প্রবল তরঙ্গ তুফান সহ্য করত আপনারদের শরীর ত্যাগ করিয়া ভাবী মনুষ্য-জাতির জন্য বিশাল দ্বীপপুঞ্জ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, মনুষ্য তেমনি বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশের জন্য জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিয়া আপনারও পারলৌকিক সম্বল সংগ্রহ করত প্রস্থান করিবার জন্যই এই মর্ত্ত্য লোকে অবতীর্ণ হইয়াছে। মনুষ্য এখানে রাজ্য সাম্রাজ্যই বিস্তার করুক, খ্যাতি প্রতিপত্তিই লাভ করুক, তাহাকে কালেতে সকলই পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। সে স্বীয় উপার্জ্জিত জ্ঞান বিজ্ঞানবলে যে সকল কার্য্যই সংসাধন করুক, তাহাকে সকলই ছাড়িয়া যাইতে হইবে। কেহই তাহার সঙ্গী, কিছুই তাহার সম্বল হইবে না। অধিক কি, তাহার পার্থিব শরীরকে পৃথিবীতেই রাখিয়া যাইতে হইবে; তাহার স্নেহ মমতার সামগ্রী সমস্তই পরিত্যক্ত হইবে, কেবল এক আত্মাই লোকান্তরে আবার উচ্চতর কার্য্যসাধনের জন্য চলিয়া যাইবে। আত্মাকে দেখিলে, আত্মাকে লইয়া গণনা করিতে গেলেই, মনুষ্য যে কি, তাহার প্রকৃতি যে কি প্রকার উচ্চতর, তাহা বিশদ রূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। সেই জন্যই সকল দেশে, সকল বিদ্যা মধ্যে আত্ম-জ্ঞান—আত্ম-তত্ত্বই গুরুতর বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। সেই জন্যই আত্ম-তত্ত্ব-বিৎ জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রেই সকল জনপদমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পূজিত ও সমাদৃত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি সংসার-সমরে যে পরিমাণে জয় লাভ করিতে পারেন, যে মনুষ্য পরমার্থসাধনে যত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন, তিনি সেই পরিমাণেই বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশের সন্নিধানে শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। তিনি নিজের ভবিষ্যৎ গম্য পথও ততই সরল ও সুগম করিতে সুপারগ হয়েন।

আপাততঃ দেখিতে গেলে, মনুষ্যের অবস্থা যেন কেবল সংগ্রামের অবস্থা বলিয়াই বোধ হয়। তাহার সম্মুখ পশ্চাতে কেবলই প্রতিবন্ধক, তাহার চতুর্দ্দিকে কেবলই বাধা বিঘ্ন। যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা, যে ধর্ম্মধন উপার্জ্জন করা, যে ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করা তাহার জীবনের সারতম কার্য্য, তাহার প্রাণ ধারণের প্রধান-তম লক্ষ্য, সেই লক্ষ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইতে গেলেই, তাহাকে ঘোর যুদ্ধ বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইতে হয়। বাহিরের শত্রুর কথা দূরে থাকুক, তাহার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, মনের বৃত্তি প্রবৃত্তির প্রতিকূলেই তাহাকে সর্ব্বাগ্রে দণ্ডায়মান হইতে হয়। এই যে বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে, ইহার চেতন অচেতন পদার্থ-পুঞ্জ যেন সমবেত যত্নে তাহার কার্য্য

কলাপকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিবার জন্য দণ্ডায়মান হয়। পার্থিব শোভা সৌন্দর্য্য সকল, যেন তাহাকে বিমুগ্ধ ও বিভ্রান্ত করিবার জন্যই সমুৎসুক হইয়া থাকে। আত্মারই লক্ষ্য সাধনের জন্য এই সুকৌশল-সম্পন্ন শরীর, এই পরমাদ্ভুত-বৃত্তি-প্রবৃত্তি-সমন্বিত মন, প্রদত্ত হইয়াছে। ইহারা আত্মারই দাসত্বে, আত্মারই লক্ষ্য সাধনার্থে নিয়োজিত হইয়াছে কিন্তু কার্য্যকালে যেন তাহারা তাহার অনিষ্টসাধনেই অগ্রসর হইয়া থাকে। আত্মা, নেত্র-গবাক্ষ দিয়া বহির্জগতের শোভা সৌন্দর্য্যের মধ্যে ঈশ্বরের জ্ঞান-প্রেম-ছবি দেখিবার জন্য অভিলাষ করে, নয়নযুগল পার্থিব সৌন্দর্য্যেই বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে। আত্মা, শ্রবণ-ইন্দ্রিয় সহকারে ব্রহ্মযশোগীত শুনিবার জন্য আগ্রহবান হয়, শ্রবণযুগল কেবল শব্দমাধুর্য্যে মোহিত হইয়া যায়। আত্মা, শরীর-বাহনে আরোহণ করিয়া, এই বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রে, স্রষ্টা পাতার প্রিয় কার্য্য সাধনার্থে প্রবৃত্ত হয়, শরীর কেবল আত্মসুখ সাধনের জন্য লালায়িত হইয়া আত্মাকে নিরাশ-পঙ্কে নিক্ষেপ করে। আত্মা, ঈশ্বরের জ্ঞান প্রেম লাভের জন্য পিপাসু হইয়া মানসিক বৃত্তি প্রবৃত্তি সকলকে তাহা আহরণ করিবার জন্য আদেশ করে, তাহারা সাংসারিক অনিত্য বস্তুর লোভে মোহিত হইয়া, আত্মার মহান্ লক্ষ্য সাধনে নিবৃত্ত হয়। বস্তুতই কি শরীর মন, আত্মার শত্রুতা সাধনের জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছে? বস্তুতই কি এই বাহ্য জগৎ, আত্মার শিক্ষা-সাধন-পথ নিরোধ করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে? যে মঙ্গলময় পূর্ণজ্ঞান পরমেশ্বর আত্মার স্রষ্টা-পাতা-বিধাতা, মর্ত্ত্যলোকের মধ্যে উন্নতিশীল আত্মার সৃষ্টিতেই যাঁহার জ্ঞান প্রেম অমৃত ভাব বিশেষ রূপে সুব্যক্ত হইয়াছে, তিনি এই শরীর-সংসারকে কখনই আত্মার কারাগৃহ করিয়া দেন নাই। প্রত্যুত ইহারদিগকেই তিনি আত্মার লক্ষ্য সাধনের সোপান, আত্মার জ্ঞান ধর্ম্ম উপার্জ্জনের মহত্তর উপায় অবধারিত করিয়া দিয়াছেন। প্রথম পাদ-চালনার সময় যেমন শিশু পুনঃ পুনঃ পতিত হয়, প্রথম শিক্ষার সময় যেমন বালক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে ভীত হয়, সেই রূপ সাধকের পক্ষে পরমার্থ সাধনের প্রথম অবস্থাতেই সকল বস্তুই বাধাবিঘ্নকর বলিয়া বোধ হয়। শিশু, যখন পাদ চালনা শিক্ষা করিয়া দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ হইয়া যৌবন-সীমায় উপনীত হয়, তখন সে সহজেই হিমালয় উল্লঙ্ঘন করিতে পারে; জ্ঞানপিপাসু ছাত্র যখন বহু কষ্ট ক্লেশের পর জ্ঞানের আস্বাদ প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার আর কোন বাধাকেই বাধা বলিয়া বোধ হয় না; তেমনি সাধক সংযতেন্দ্রিয় হইয়া যখন একবার ব্রহ্মামৃতের আস্বাদ প্রাপ্ত হন্, তখন সমুদ্রসমান বাধা, তাঁহার নিকট শিশিরবিন্দুতুল্য; হিমালয়-সমান প্রতিবন্ধক তাঁহার সন্নিধানে বালু-কণার ন্যায় সামান্য বোধ হয়। প্রথম অশ্ব-আরোহণ শিক্ষা করাই কষ্টকর, একবার সুনিপুণ আরোহী হইয়া উঠিলে, অশ্ব তাহার পদানত দাস হইয়া পড়ে। প্রথম ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে প্রবৃত্ত হওয়াই দুঃসাধ্য, একবার কৃতকার্য্য হইতে পারিলেই, তাহারা অনুগত ভৃত্যের ন্যায় ইঙ্গিত মাত্রেই ইষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হয়। অরূপী অশরীরী ঈশ্বরের পূজার্চ্চনা, ধ্যান-ধারণা-অভ্যাসের সময়েই নানা বিঘ্ন বিপত্তি, একবার তাহা অভ্যস্ত হইলেই নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ হইয়া পড়ে। ব্রহ্ম-লাভের উদ্যোগ উদ্যমই অমানুষিক ব্যাপার বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে, কিন্তু যখন ঈশ্বর একবার সাধকের আত্মাতে প্রকাশিত হন্, তখন তাঁহাকে “করতল-ন্যস্ত আমলকবৎ” বোধ হয়।

এই জন্যই তপঃসিদ্ধ আপ্তকাম ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন যে "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব ব্রহ্ম-বিদাপ্নোতি পরম্।' তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর, ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহারা ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে, চরিত্রশোধনে চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনে সুনিপুণ হইয়া, ব্রহ্মলাভে কৃত-কার্য্য হওত উৎসাহের সহিত ভবিষ্যৎ বংশের জন্য এই নিশ্চয়াত্মক আশাপ্রদ উপদেশ বাক্য রাখিয়া গিয়াছেন; আমরা বর্ত্তমানে নানা বাধাবিঘ্নের মধ্যে তাহাই অবলম্বন করত ব্রহ্মলাভের চেষ্টা করিতেছি। ভবিষ্যৎ বংশও এই আশা-সূত্র অবলম্বন করিয়া আত্মোন্নতি সাধনে যত্ন-যুক্ত হইবে। ব্রহ্মলাভ যেমন আত্মার লক্ষ্য, মানব আত্মাতে প্রকাশিত হওয়াও তেমনি আবার ব্রহ্মের ইচ্ছা। সেই ইচ্ছা সংসাধনের জন্যই এই শরীর, এই মন, এই আত্মার সৃষ্টি। সেই লক্ষ্য সম্পাদনের নিমিত্তই এই পরমাদ্ভুত-কৌশল-পূর্ণ বিচিত্র বিশ্বের রচনা। যে পরিমাণে আমরা সাধন-নিপুণ তপঃসিদ্ধ হইতে থাকিব, সেই পরিমাণেই আমরা ব্রহ্মদর্শনে সমর্থ হইব; সেই পরিমাণেই আমারদের শরীর মন আত্মা ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনে তৎপর হইবে, সেই পরিমাণেই এই বিশ্বসংসার ঈশ্বরের জ্ঞান প্রেম মঙ্গল ভাবের সুবিমল ছবি প্রদর্শনে সমর্থ হইয়া আমারদের আত্মাকে ব্রহ্মলাভে প্রোৎসাহিত করিতে থাকিবে। ইহাই সাধকের জপতপঃ, যাগ যজ্ঞ——ইহাই ব্রহ্মোপাসকের ব্রত ধর্ম্ম, ক্রিয়াকর্ম্মের প্রত্যক্ষ ফল।

এখনই দেখ!—এখনই সকলে এই বাক্যের যাথার্থ্য প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কর! আমরা শান্ত সংযমী হইয়া এই উৎসবক্ষেত্রে ব্রহ্মদর্শনের জন্য সমাসীন হইয়াছি, উপরে এক সূর্য্য সহস্র রশ্মি বিকীর্ণ করিয়া এক ঈশ্বরের শক্তি সত্তা প্রদর্শন করিতেছে। এই এক পৃথিবী বিবিধ সৌন্দর্য্যে সুশোভিত হইয়া আমারদের সম্মুখে সেই একেরই কীর্ত্তিকলাপ প্রদর্শন করিতেছে। আজিকার প্রাতঃসমীরণ—আনন্দ হিল্লোল কেমন নিঃশব্দে হৃদয়-কবাট উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়া আত্মার মধ্যে সেই এক অদ্বিতীয় অন্তরতম প্রিয়তম পরমেশ্বরকে দেখাইয়া দিতেছে! আমরা চর্ম্ম-চক্ষু উন্মীলিত করিয়া জগন্মন্দিরে যেমন জগদীশ্বরকে সহজে নিরীক্ষণ করিতেছি, তেমনি জ্ঞান-নেত্র উন্মুক্ত করিয়া আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে সন্দর্শন করত কৃতার্থ হইতেছি। এই যে ব্রহ্ম-দর্শন-জনিত আনন্দ উৎসব, ইহা কি সাধকের একদিনের যত্ন চেষ্টা, উদ্যোগ উদ্যমের ফল? যিনি এই উৎসব-ভূমিতে অদ্য প্রথম পদার্পণ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে হয় তো ব্রহ্মোপাসকদিগের আধ্যাত্মিক বাক্যালাপ তত তৃপ্তিকর উৎসাহকর বলিয়া বোধ হইবে না। অরূপী অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরকে যে কেমন করিয়া অন্তরে বাহিরে জাগ্রৎ জীবন্তরূপে উপলব্ধি করা যায়, কেমন করিয়া যে সেই বিশ্বস্রষ্টা অখিলবিধাতা পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ পিতা মাতা, সুহৃৎ বন্ধু সখা বলিয়া প্রতীতি করত ব্রহ্মোপাসকগণ তাঁহার পূজার্চ্চনা, ধ্যান ধারণা করিতেছেন, হয় তো তিনি তাহা কখনই বিশদরূপে অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন না। যাঁহারা সাধনপরায়ণ, তাঁহারাই প্রকৃতরূপে এই পুণ্য দিনের এই মঙ্গল মুহূর্ত্তের যথার্থ মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন। যাঁহারা তত্ত্বদর্শী, তাঁহারাই মাঘের একাদশ দিবসকে ভারতের সৌভাগ্য-সূর্য্যের অভ্যুদয়-দিন জানিয়া সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আর্য্যকুল-দেবতা ব্রহ্মেরই জয়ঘোষণা করিতেছেন। যাঁহারা দূরদর্শী, তাঁহারা

এই পবিত্র দিবসকেই সমগ্র পৃথিবী মধ্যে শান্তি-যুগ প্রবেশের দিন বলিয়া অন্তস্ফূর্ত্ত বাক্যে ব্রহ্মেরই মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। অতএব হে ভারত-বাসি! হে সমগ্র ভূমণ্ডল-নিবাসী নর নারীগণ! সকলে একসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আনন্দ মনে, একাগ্র হৃদয়ে এই উৎসব-ভূমিতে অবতরণ কর। সকলে বিমল-হৃদয়ে সেই বিশ্ব-বিধাতা পরমেশ্বরকে হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি, প্রীতি কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিয়া জীবনকে সার্থক কর, বসুমতীকে পুণ্যবতী কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

দেখিতে তরঙ্গময় ভব পারাবার। তরঙ্গ সে কিছু নয় আতঙ্কই সার।

অসীমের ভাব যত হৃদয়ে আনিবে তত ক্ষুদ্র তৃণটীর মত দেখিবে সংসার।

কত ঝড় বহে যাবে হৃদয় অটল রবে, কি ভয় কি ভয় তবে।

অতিক্রমি দুখ শোকে, অনন্ত অনন্ত লোকে, নিরখিবে অনন্তের মহিমা অপার।

একোনপঞ্চাশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ই মাঘ বৃহস্পতিবার ১৮০০ শক।

সায়ংকাল।

শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা।

জনসমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে, ইহা কেবল বিবাদ কলহে, নিন্দা অসূয়ায়, বিদ্বেষ অশান্তিতে পরিপূর্ণ!! সংসারের মধ্যে যেন মঙ্গল অপেক্ষা, অমঙ্গলের ভাগই অধিক, সুখ অপেক্ষা এখানে অসুখেরই একাধিপত্য; সদ্ভাব ভ্রাতৃভাবের পরিবর্ত্তে এখানে যেন বিদ্বেষ ও শত্রুতাই অধিকতর রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখানে ধনী, নির্ধনের নির্যাতনে দৃঢ়ব্রত; জ্ঞানী অজ্ঞানের প্রতি পশুবৎ আচরণে নিরত; ভ্রাতা ভ্রাতার সর্ব্বস্ব শোষণে নিযুক্ত, প্রতিবেশী, প্রতিবেশীর অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। লোক-সমাজের মধ্যে বিষয়ের সম্মান সমাদর ধর্ম্মেরই অধিকতর অসম্মান ও অনাদর দৃষ্ট হয়। অন্যের মজ্জা শোণিত শোষণ করিয়া যিনি স্বীয় শরীরকে পোষণ করেন, সহস্র ব্যক্তিকে যিনি নিঃসম্বল করিয়া আপনার সুখ ঐশ্বর্য্য বর্দ্ধিত করেন, মনুষ্য-সমাজে তিনি উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন, আর যিনি আপনার যথা-সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া দেশের কল্যাণ সাধনে, লোকের জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি সম্পাদনে নিযুক্ত হয়েন, তাঁহাকেই নিন্দিত ঘৃণিত, প্রতারিত অপমানিত হইতে দেখা যায়। এখানে লোকে কেবল মান সম্ভ্রমের জন্য, খ্যাতি প্রতিপত্তির নিমিত্তই, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া, নিত্য সংগ্রামে নিযুক্ত হওত কেবল সত্যের অসম্মান, ধর্ম্মের অবমাননা করিতেছে। সংসার কি ভয়ানক স্থান! মনুষ্যসমাজের এরূপ পশুবৎ ব্যবহার দৃষ্টি করিলে, কোন্ চিন্তাশীল ব্যক্তির হৃদয় না ব্যথিত হয়? কোন্ সাধু সদাশয় মনুষ্যের না সংসারের প্রতি বিদ্বেষ উপস্থিত হইয়া থাকে? কিন্তু আমরা যে বসুধা-বক্ষে অবস্থান করিতেছি, যে সকল বৃক্ষ লতায় পরিবৃত রহিয়াছি, যে সকল পশু পক্ষী অবলোকন করিতেছি, তাহারদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহার বিপরীত ভাবই দেখা যায়। ভৌতিক জগতের একটি সূক্ষ্মতম বালুকণাকে দেখ,

তাহার মধ্যেও মঙ্গল লক্ষ্য সঞ্চরণ করিতেছে, একটি সামান্য বৃক্ষপত্রের রচনাকৌশল পরীক্ষা কর, তাহার অভ্যন্তরেও মঙ্গল উদ্দেশ্য কার্য্য করিতেছে, পশু পক্ষীর গুণ প্রকৃতি পর্য্যালোচনা কর, তাহার মধ্যেও কল্যাণ-কামনা দীপ্তি পাইতেছে, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইবে। কে না জানে যে চন্দ্র ও সূর্য্য জড় উদ্ভিদ, জীব ও জন্তু জগতের জীবন! কে না জানে, যে জল ও বায়ু, স্থাবর জঙ্গমপূর্ণ পৃথিবীর প্রাণ? কে না জানে, বৃক্ষ লতা—ওষধি বনস্পতি সমূহ, জীব রাজ্যের প্রত্যক্ষ ঔষধ ও উপজীবিকা? এই সমুদায় সৃষ্টিতে কি বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বরের শুভ কামনা দীপ্তি পাইতেছে না? ইহারা কি সমবেত যত্নে অহোরাত্র আমারদের কল্যাণ সম্পাদন করিতেছে না? চন্দ্র সূর্য্য, ওষধি বনস্পতির কথা দূরে থাকুক তাহারা মনুষ্যের অনেক নিম্ন শ্রেণীতে অবস্থান করিতেছে। তাহারা দুশ্ছেদ্য ভৌতিক নিয়মের দাস, তাহাদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা, স্বেচ্ছাশক্তি প্রভৃতির অসম্ভাব। যাহাতে জ্ঞান শক্তি স্বাধীনতা বর্ত্তমান, সেই মনুষ্যের শরীর মন আত্মাকেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখ, তাহার শরীরের অস্থি চর্ম্ম শিরা শোণিতে, তাহার মনের বৃত্তি-প্রবৃত্তিতে, তাহার আত্মার ভাব ও অধিকারে সেই মঙ্গল লক্ষ্য, সেই কল্যাণ কামনা, সেই শুভ উদ্দেশ্য দেদীপ্যমান রহিয়াছে কি না? শরীর সুস্থ সবল ও কার্য্যক্ষম হয়, এই উদ্দেশেই তাহা বিচিত্র উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছে; মন, জ্ঞান বিজ্ঞান উপার্জ্জনে সমর্থ হয়, আপনার ও অন্যের সুখ সাধনে কৃতকার্য্যতা লাভ করে, এই কামনাতেই তাহাতে দুর্লভ বৃত্তি প্রবৃত্তি সকল প্রদত্ত হইয়াছে। বিভিন্নপ্রকৃতি, বিভিন্নস্বভাববিশিষ্ট মনুষ্যসমাজ মধ্যে, বিচিত্র ঘটনার অভ্যন্তরে যাহাতে আত্মা বিভ্রান্ত ও দিশাহারা হইয়া না যায়, যাহাতে পশুগণমধ্যে পরিগণিত হইয়া না পড়ে, সেই জন্য করুণাময় পরমেশ্বর আত্মাকে অসদৃশ উন্নত ভাব ও উচ্চ অধিকার প্রদান করিয়াছেন। যাহাতে আত্মা, অমঙ্গলের মধ্যে মঙ্গল, অশান্তির মধ্যে শান্তি, অনৈক্যের মধ্যে প্রকৃত ঐক্য স্থাপন করিয়া শান্তি-মঙ্গল-সদ্ভাবে জগতের উন্নতি-সাধন করিয়া, আপনাকেও উন্নত করিতে পারে, এই শুভ উদ্দেশে করুণাময় পরমেশ্বর তাহার অভ্যন্তরে তাহার শিক্ষা-সাধান, ক্রিয়া-কর্ম্মের অভ্রান্ত আদর্শ রূপে আপনিই নিয়ত প্রকাশ পাইতেছেন। সেই হৃদিস্থিত অনন্ত-জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরকে আদর্শ করিয়া—তাঁহার আদেশ উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া চলিলে সংসার সুখের আধার, শান্তির আলয়, আনন্দের নিকেতন হইয়া উঠে; মনুষ্যও ক্রমে দেবভাবে উন্নত হইয়া পৃথিবীর মুখশ্রীকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারে। সেই আদর্শকে ছাড়াইয়া মনুষ্য-সমাজের এই বিষম দুঃখ দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে! পিতাই সকল সম্বন্ধের মূল, পিতা হইতেই আমরা সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ গণনা করি। সেই পিতাকে পরিত্যাগ করিলে আর কাহারও সহিত আমারদের কোন সম্বন্ধ সংযোগ থাকে না। যত দিন পিতা বর্ত্তমান থাকেন, ভ্রাতা-ভগিনীগণের মধ্যে সহস্রবিধ অনৈক্যের কারণ থাকিলেও তাহা স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। বরং পিতার আদেশ উপদেশে তাহা সমূলে নির্ম্মূলিত হইয়া থাকে। পরিবারের মধ্যে শান্তি-সদ্ভাবই সঞ্চরণ করে। কিন্তু পিতৃহীন পরিবারের কি ভয়ানক দুঃখ-দুর্গতি। ভ্রাতা, ভ্রাতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া থাকে; সহোদরা, সহোদরার সর্ব্বস্বান্ত করিতে কৃত-সংকল্প

হয়। সেই শান্তির আলয় পিতৃ-নিকেতন এককালে বিবাদ-বিসম্বাদ, অমঙ্গল অশান্তির আধার হইয়া উঠে।

সেই ব্যক্তিগত মঙ্গল ভাব, মঙ্গল লক্ষ্য; সেই ব্যষ্টিগত জ্ঞান প্রেম, শান্তি মঙ্গলের পূর্ণ আদর্শকে সমষ্টির মধ্যে লইয়া চল; ক্ষুদ্রায়তন গৃহ পরিবার হইতে, সুবিশাল সংসার মধ্যে তাঁহাকে আনয়ন কর, সকল অন্ধকার চলিয়া যাইবে, সকল বিবাদ তিরোহিত হইবে, সকল দুঃখ দুর্গতি পলায়ন করিবে। মনুষ্য, তাঁহাকে নেতা না করিয়া—তাঁহার উদার উন্নত মঙ্গল আদর্শের অনুবর্ত্তী না হইয়াই সংসারের এই শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত করিয়াছে। তাঁহার আদেশ উপদেশের বশবর্ত্তী না হইয়াই স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়িয়াছে। লোকে তাঁহার পবিত্র সিংহাসনে ভ্রম-প্রমাদ-পরিপূর্ণ স্বার্থঅন্ধ মনুষ্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া—সেই দূষিত আদর্শে পরিচালিত হইয়াই ঐক্যের মধ্যে অনৈক্য, প্রণয়ের মধ্যে অপ্রণয়, শান্তির মধ্যে অশান্তি, মঙ্গলের মধ্যে অমঙ্গল, অমৃতের মধ্যে বিষ-রাশি, ধর্ম্মের মধ্যে অধর্ম্ম আনয়ন করত ঈশ্বরের প্রেমের রাজ্যকে ছারখার করিতেছে !!

এই দুঃখ দুর্গতি পরিহারের কি কোন উপায় নাই? এই শোচনীয় অনৈক্যের মধ্যে কি প্রণয় ঐক্য স্থাপনের কোন পন্থা নাই? চিরকালই কি আনন্দময়ের রাজ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ, দুঃখ-নিরানন্দ বর্ত্তমান থাকিবে? চির কালই কি মনুষ্য এখানে মনুষ্যের কুহকে পতিত হইয়া প্রবঞ্চিত ও প্রতারিত হইবে? চির দিনই কি মনুষ্য, অসম্পূর্ণ জীবের বিদ্যা বুদ্ধির, গতি-প্রবৃত্তির অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া সঙ্কীর্ণ জ্ঞান-ধর্ম্ম-স্রোতে ঘূর্ণিত হইতে থাকিবে? পৃথিবীর বয়োবৃদ্ধি সহকারে কি ঈশ্বরের সুবিস্তৃত পরিবার মনুষ্য-জাতি শতধা বহুধা হইয়া—ছিন্ন ভিন্ন উৎসন্ন হওত নানা দলে বিভক্ত হইয়া কেবল হীনবল হইয়াই পড়িবে? তাহারদের কি দাঁড়াইবার ঐক্যস্থল নাই? তাহারদের প্রতি কি কাহারও স্নেহ-দৃষ্টি, প্রীতি-দৃষ্টি নাই? তাহারদের উপরে কি দেব-প্রসাদ বর্ষিত হইতেছে না? তাহারদের অন্তরে কি আত্ম-প্রভাব দীপ্তি পাইতেছে না? সংসারের প্রতি ঈশ্বরের স্নেহ-দৃষ্টি, প্রীতি-দৃষ্টি না থাকিলে ইহার প্রত্যেক অণু পরমাণুতে, এখানকার প্রতি বৃক্ষপত্রে, শৈবাল-সূত্রে কেন তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা মুদ্রিত থাকিবে? এখানকার প্রত্যেক ঘটনাতে কেন তাঁহার শুভ সঙ্কল্প প্রকাশ পাইবে? মনুষ্যের হৃদয়-কন্দরে কেন স্নেহ প্রীতি দয়া ধর্ম্মের সুবিমল উৎস উৎসারিত হইবে? মানব আত্মাতে তাঁহার সত্য সুন্দর মঙ্গল রূপ কেন মুদ্রিত থাকিবে? ভারতের অন্ধতম সময়ে কেন এখানে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হইবে? মনুষ্য সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া—সহস্রবিধ সুখ সম্পদে জলাঞ্জলি দিয়া কেন আত্ম-প্রভাবে সত্যের দিকে, মঙ্গলের দিকে, ঈশ্বরের অভিমুখে ধাবিত হইবে?

সেই বিশ্বজনসম্ভজনীয় পরমেশ্বরই সমগ্র দেব মনুষ্যের একমাত্র গম্য স্থল। পরম পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মই সমুদায় মনুষ্য-জাতির একমাত্র ঐক্য-ভূমি। সেই অমৃত নিকেতনের প্রতি অন্তশ্চক্ষু উন্মীলিত হইলে, এই ঐক্য-ভূমি-স্বরূপ পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের শীতল ছায়ায় উপনীত হইলেই পৃথিবী হইতে বিবাদ কলহ, দ্বন্দ্ব, বিচ্ছেদ, সকলই তিরোহিত হইয়া যাইবে।

নদ নদী সকল যখন দেশ প্রদেশ মধ্যে প্রবাহিত হয়, তখন তাহারা সঙ্কীর্ণ ভাবে নানাদিকে ধাবিত হইতে থাকে, কিন্তু যত সিন্ধু সাগরের নিকটবর্ত্তী হয়, ততই যেমন

তাহারা উদার-ভাবে একমুখ হইয়া পড়ে, তেমনি মনুষ্য-জাতি যখন কর্ম্মভূমিতে বা বিষয়ক্ষেত্রে গমন করে, তখন তাহারদের বিচিত্র রুচি প্রবৃত্তি নিবন্ধন গম্যপথ শতমুখ বহুমুখ হওয়াই সম্ভব, কিন্তু ঈশ্বরের দিকে যাইবার সময় সকলেরই গতি সেই "একায়নং" সেই একেরই দিকে। তাঁহার দিকে যাইয়াও যদি ঐক্য লাভ না হয়, তাঁহার ধর্ম্মের শীতল ছায়ায় উপনীত হইয়াও যদি শান্তি মঙ্গল লাভ না হয়; তাঁহার সেবক উপাসক হইয়াও যদি বিবাদ বিসম্বাদ, দ্বন্দ্ব কলহ হইতেও নিষ্কৃতি লাভ করিতে না পারা যায়, তবে নিশ্চয় জানিও যে, এখনও সেই সরল বর্ত্ম প্রাপ্ত হই নাই; এখনও সেই অমৃত পথের যাত্রী হইতে পারি নাই; এখনও সেই "বিগতবিবাদ" মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বরের অনন্যপরায়ণ ভক্ত হইতে সমর্থ হই নাই, এখনও ভ্রান্তিচক্রে ঘূর্ণিত হইতেছি, এখনও ঈশ্বর হইতে বহু দূরে নিপতিত রহিয়াছি। ঈশ্বর-উপাসনার প্রত্যক্ষ ফল আরাম; ব্রহ্মসাধনের নিশ্চিত পুরস্কার শান্তি; ব্রহ্মলাভের অব্যর্থ ফল মুক্তি। যখন এখনও আমরা সম্পূর্ণ রূপে তাহা লাভ করিতে পারি নাই, তখন সেই লক্ষ্য স্থলে যে এখনও উপনীত হইতে পারি নাই, তাহা অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে হইবেই হইবে। কিন্তু যখন রোগ নির্ণীত হইয়াছে, তখন আরোগ্য লাভের সম্পূর্ণ প্রত্যাশা হইতেছে। যখন জানিতেছি যে, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া—তাঁহার উদার উন্নত নিষ্কলঙ্ক স্বরূপের অনুকরণ না করিয়াই, জনসমাজের এই দুঃখ দুর্গতি, অমঙ্গল অধোগতি লাভ হইতেছে, তখন কি আর বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন মনুষ্য, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে? তাহার আদেশ উপদেশের অনুবর্ত্তী না হইয়াই, যখন এখানে এত দ্বন্দ্ব কলহ উপস্থিত হইয়াছে, তখন কি আর মানব-জাতি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া মনুষ্যের কুটিল বাক্যের প্রতি-কর্ণপাত করিবে? তাঁহার অনুগত শরণাগত না হইয়া কি মনুষ্য আর নিশ্চিন্ত থাকিবে?

এখনই দেখ! সকলে প্রত্যক্ষ সন্দর্শন কর, এই অতি অল্প কালের জন্য আমাদের আত্মা সেই ব্রহ্মের অভিমুখীন হইয়াছে; আমারদের বৃত্তি প্রবৃত্তি সকল, সেই পরব্রহ্মের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছে; আমারদের সকলেরই লক্ষ্য সেই একেরই প্রতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এখন আমারদের মধ্যে কেমন অখণ্ড শান্তি বিরাজ করিতেছে। কেমন দুশ্ছেদ্য ভ্রাতৃভাব অভ্যুদিত হইয়াছে! চারি দিকে কেমন আনন্দপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়া সকলেরই হৃদয় মন প্রফুল্ল করিয়া তুলিয়াছে! এই উৎসব-বর্ত্তিকা নির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গেই যেন মর্ত্ত্য লোক হইতে এই দেবভাব তিরোহিত না হয়। বহু কষ্ট ক্লেশের পর আমরা যে আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য-সম্পদ লাভ করিয়াছি—আমরা যে ঐক্য আরাম-স্থলে উপনীত হইয়াছি, এই সুখ-যামিনী অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই যেন তাহা অপহৃত না হয়! ভৌতিক জগতের ন্যায় আমারদের আধ্যাত্মিক রাজ্যের পক্ষেও অদ্য শুক্ল প্রতিপদ মাত্র। আমরা দেবলোক হইতে দেবলোকে, ব্রহ্ম-পূজা-জনিত যে সকল মহান্ উৎসব লাভ করিতে থাকিব, মর্ত্ত্যের এই মহোৎসব তাহার ছায়া মাত্র। আমারদের আত্মা লোকলোকান্তরে ঈশ্বরের যে অযুত অগণ্য শান্তি-মঙ্গল-জ্যোতিতে অনুরঞ্জিত হইয়া দীপ্তি পাইবে, এখানকার সদ্ভাব ধর্ম্মভাব সকল তাহার একটি ক্ষীণ রশ্মি ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব বর্ত্তমানের শান্তি মঙ্গলের আভাস মাত্র পাইয়া যেন পরিতৃপ্ত না হই—যেন আমরা আপনারদিগকে কৃতকার্য্য মনে না করি। আত্মার

আশা অধিকার অনন্ত; আত্মার শিক্ষা-শোধন-ক্ষেত্র অসীম; আত্মার লক্ষ্য-ভূমি বহু দূরে। এক ব্রহ্মের উপাসনাতেই সে সকল আশা পূর্ণ হইবে; সকল অধিকার হস্তগত হইবে; সকল শিক্ষা লব্ধ হইবে, ইহারই জন্য এখানে এই উৎসব-দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। অতএব আইস সকলে সেই উৎসব-অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পরব্রহ্মের শরণাপন্ন হই। আইস সকলে অন্তস্ফূর্ত্ত বাক্যে তাঁহার সন্নিধানে এই প্রার্থনা করি "বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব।" হে দেব! হে পিতা! পাপ সকল মার্জ্জনা কর—আমারদের পাপ সকল মার্জ্জনা কর। "যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।" যাহা ভদ্র, যাহা কল্যাণ তাহাই আমারদের মধ্যে প্রেরণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

রাগিনী ইমন কল্যাণ—তাল আড়াঠেকা।

বহুক ঝটিকা ঝড়, কাঁপায়ে ভূধরবর,
ভবের তরঙ্গ ভঙ্গে বিচলে কি এ হৃদয়,
ধরিয়ে চরণ যাঁর, বিচরি এ পারাবার;
সর্ব্বশক্তিমান তিনি তাহাতে মঙ্গলময়,
ঘিরুক্‌না ঘোর ঘন দিগন্ত ব্যাপিয়ে,
নিরখিব ধ্রুব তারা সে মুখ চাহিয়ে,
আশ্রয় অভয়দাতা ভ্রূক্ষেপি সহস্র বাধা
লুকাব অমৃত ক্রোড়ে কিসে আর করি ভয়।

রাগিনী পরজ—তাল আড়াঠেকা।

রাজরাজেশ্বর ওহে দীন জনে দেখা দাও
করুণা ভিখারী আমি করুণা-কটাক্ষে চাও।
চরণে উৎসর্গ দান, করিতেছি এই প্রাণ
সংসার-অনল-কুণ্ডে ঝলসি গিয়াছে তাও।
কলুষ-কলঙ্কে তাহে আবরিত এ হৃদয়,
মোহে মুগ্ধ মৃত প্রায়, হয়ে আছি দয়াময়
সঞ্জীবনী দৃষ্টে তব শোধন করিয়ে লও।

শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা।

১০ মাঘ বুধবার ১৮০০ শক।

গৃহস্থঃ পালয়েৎ দারান্ বিদ্যামভ্যাসয়েৎ সুতান্।
ব্রাহ্মধর্ম্ম ২য় খণ্ড, ৩য় অ, ১ম শ্লোক।
কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।
ঐ ঐ ঐ ২য় শ্লোক।

গৃহস্থ স্বীয় স্ত্রীকে প্রতিপালন করিবেক, পুত্রদিগকে বিদ্যাভ্যাস করাইবেক।

কন্যাকেও এইরূপ পালন করিবেক ও অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

পুণ্যাত্মা কাহাকে বলে এবং পুণ্যাত্মা ও পাপিষ্ঠের মধ্যে প্রভেদ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে সামান্যতঃ ইহা বলা যাইতে পারে যে, যিনি কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করেন, সমুদায় কর্ত্তব্য কর্ম্ম যাঁহার দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, যিনি কখনও কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কার্য্য করেন না, কর্ত্তব্যসাধনের কোন প্রকার ত্রুটি হইলে যাঁহার মন বিষম আত্মগ্লানিতে পরিপূরিত হয় তাঁহাকেই পুন্যাত্মা বলে। এবং যে তাহার বিপরীত, যাহার দ্বারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমূহ প্রকৃত রূপে অনুষ্ঠিত হয় না, কর্ত্তব্য সাধনের পক্ষে যাহার দৃষ্টি নিতান্ত ক্ষীণ সেই ব্যক্তিই পাপিষ্ঠ। যাহাতে আমরা পুণ্যাত্মা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারি, সাধুর লক্ষণ সমস্ত আমাতে অবস্থিতি করে, এবং যাহাতে আমি প্রকৃতরূপে পুণ্য-পথের পথিক হই, তাহার ইচ্ছা মনুষ্য মাত্রেরই না থাকুক, কিন্তু অনেকের মনে যে সেই ইচ্ছা বিশেষ প্রবল সে বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবল মাত্র ইচ্ছা থাকিলে কি হইবে? চেষ্টার অভাবে এই অভিলষিত সামগ্রী লাভে অনেকেই বঞ্চিত; এবং চেষ্টা থাকিলেও আমাদিগের কি কর্ত্তব্য এবং কি অকর্ত্তব্য, তাহার জ্ঞান না থাকায় আমরা কর্ত্তব্য সাধনে অক্ষম হই। এই নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে কর্ত্তব্য নির্ব্বাচন করা

আমাদিগের সকলেরই উচিত। সাধারণতঃ সকলেই ইহা স্বীকার করেন যে ঈশ্বরের প্রতি আমাদিগের যে সমস্ত কর্ত্তব্য তাহাই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য; কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি আমাদিগের কি কর্ত্তব্য তাহা বিশেষরূপে অবগত না থাকায় আমাদিগের ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদয় সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। অনেকে হয়ত কেবলমাত্র ধ্যান ধারণা ও স্তুতিবাদকেই ঈশ্বরপরায়ণতার শেষ মনে করেন। পরমেশ্বরে পূর্ণ প্রীতি ও ভক্তি শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে যে তাঁহার প্রতি কোন প্রকার কর্ত্তব্য সাধন হয় না একথা অবশ্য স্বীকার্য্য। যিনি ঈশ্বরকে প্রীতি না করেন তাঁহার পক্ষে ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন কিরূপে সম্ভবে? ঈশ্বরকে প্রীতি না করিয়া ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য সমূহের সম্পাদন কর্ত্তব্য শব্দের ব্যভিচার মাত্র। প্রীতি কর্ত্তব্যের আধার, ঈশ্বর-প্রীতিই আমাদিগের কর্ত্তব্য সমূহের ভিত্তিস্বরূপ। ভিত্তিহীন প্রাসাদের কল্পনা যে রূপ উপহাসের যোগ্য প্রীতিবিহীন কর্ত্তব্যসাধনের মননও সেই প্রকার অকর্ম্মণ্য। কিন্তু যেমন কেবলমাত্র ভিত্তিকে আমরা প্রাসাদ মনে করিতে পারি-না, সেইরূপ কেবলমাত্র ধ্যান ধারণা ও স্তুতিবাদ দ্বারা আমাদিগের ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য সমূহ সম্পন্ন হয় না; বরং বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে কেবল মাত্র এই সকলের দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পন্ন হওয়া দূরে থাকুক, তদ্দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি কোন কর্ত্তব্যই সম্পাদিত হয় না। আপাততঃ শুনিতে এই কথা নিতান্ত ভয়ানক বোধ হয়। ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা ও স্তুতিবাদের দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন হয় না একথা সহজে প্রায় কেহই স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবেন না; কিন্তু তাহা অন্য আকারে উপস্থিত করা গেলে বোধ হয় তাহার যাথার্থ্য ও দৃঢ়তা সম্বন্ধে প্রায় কেহই কোন সন্দেহ করিতে পারিবেন না। সকলেই স্বীকার করিবেন যে ঈশ্বরের উপাসনাই ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য। যিনি ভ্রমপ্রমাদ বিরহিত হইয়া সরল চিত্তে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত বলিতে পারেন যে আমি ঈশ্বরের উপাসনা করি, তাঁহা কর্ত্তৃক যে ঈশ্বরের প্রতি সমস্ত কর্ত্তব্য—কেবল ঈশ্বরের প্রতি কেন, তাঁহার দ্বারা যে সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তাহা মুক্ত কণ্ঠে এক বাক্যে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এই সুবিস্তীর্ণ পৃথিবীর মধ্যে যত মনুষ্য আছে সকলকে একত্র করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে কয় জন এপ্রকার ব্রহ্মপরায়ণ ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধু আছেন যিনি বলিতে পারেন যে আমি ঈশ্বরের উপাসনা করি। ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজে দেখিতে পাই যে "তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা"; কিন্তু প্রীতি ও প্রিয় কার্য্য-সাধন পরস্পর এ প্রকার দৃঢ় গ্রন্থি দ্বারা মিলিত যে একের অভাবে অন্যের অস্তিত্ব কখনই সম্ভবে না। যেখানে প্রকৃত প্রীতি সেই খানেই প্রিয় কার্য্য সাধন। অকৃত্রিম প্রীতির পরীক্ষাই প্রিয় কার্য্য সাধন। যিনি ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করেন না তিনি নিশ্চয় জানিবেন যে তিনি ঈশ্বরকে প্রীতিও করেন না; কেননা প্রীতির প্রধান লক্ষণ এই যে তাহা প্রিয়তমের প্রিয় কার্য্য সাধন ব্যতিরেকে মনুষ্যকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দেয় না; প্রিয় কার্য্য সাধনই প্রীতির জীবন। অতএব যিনি ঈশ্বরের উপাসনা করেন তিনি কেবল মাত্র ধ্যান ধারণা ও স্তুতিবাদ দ্বারা আপনাকে আপ্তকাম মনে করেন না, কিন্তু তিনি ঈশ্বরকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধন করেন। এ কথায় কেহ ইহা

বুঝিবেন না যে ধ্যান ধারণা ও স্তুতিবাদ নিরর্থক অমূলক অপ্রাসঙ্গিক শব্দমাত্র; তাহা নহে, সে সমস্তেরও কার্য্য আছে তৎসমুদায় প্রীতির চিহ্নমাত্র কিন্তু তাহা পূর্ণ প্রীতি নহে; এই নিমিত্তই তৎসমুদায়কে প্রীতি হইতে এবং কাজেই ঈশ্বরোপাসনা হইতে পৃথক করা গেল। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে গেলে—প্রকৃতরূপে ঈশ্বরের উপাসক হইতে ইচ্ছা করিলে—তাঁহাকে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করা আবশ্যক, এবং তাঁহাকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন ব্যতিরেকে তাঁহার প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন হয় না; এবং প্রিয়কার্য্য সাধনই প্রীতির পরীক্ষা এ নিমিত্ত তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন না করিলে তাঁহাকে প্রীতি করাও হয় না। এই সমস্ত কারণে প্রকৃতরূপে ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমূহের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত তাঁহার প্রিয় কার্য্য কি তাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য কি তৎসমুদায় বিশেষ বিশেষ রূপে নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত কঠিন, এবং তৎসমুদায়ের নির্ব্বাচনও অনেক পরিশ্রম ও সময়-সাপেক্ষ; এখানে তাহাদিগের কেবলমাত্র একটী সাধারণ লক্ষণের উল্লেখ করা যাইতে পারে এবং এক্ষণকার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট হইবে। সেই সাধারণ লক্ষণ এই, করুণাময় পরমেশ্বর আমাকে যে উদ্দেশ্যে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন সেই উদ্দেশ্যের সংসাধনই আমার কর্ত্তব্য। অর্থাৎ যেমন কোন প্রভু যদি আপন ভৃত্যের হস্তে কতকগুলি দ্রব্য সমর্পণ করেন, তাহাতে সেই সমস্ত সামগ্রী যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা না করিলে ভৃত্যকে যেমন প্রভুর প্রতি কর্ত্তব্য-বিমুখ বলা যায়, করুণাময় পরমেশ্বর আমাদিগের হস্তে যাহা কিছু সমর্পণ করিয়াছেন তৎসমুদায় যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা না করিলে ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য সাধনের ব্যাঘাত হয়। এই ভূমণ্ডলে যাহা কিছু দেখিতেছি সমুদয়ই ঈশ্বরের, আমরা যাহা কিছু প্রাপ্ত হইয়াছি সমুদয়ই ঈশ্বর-প্রদত্ত এনিমিত্ত তৎ সমুদায়ের সদ্ব্যবহার করিতে আমরা বাধ্য; এবং তন্মধ্যে কোন একটীর অসদ্ব্যবহার করিলে আমরা ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হই, এমন কি আমাদিগের যে সময় আছে তাহারও সদ্ব্যবহারের ভার করুণাময় পরমেশ্বর কর্ত্তৃক আমাদিগের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে; যদি আমাদিগের সময় বৃথা অতিবাহিত হয় তাহা হইলেও আমরা ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হই! সকলেই জানেন যে এক জন ধর্ম্মনিষ্ঠ নরপতি চিরজীবন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিয়া কেবল মাত্র এক দিবস কোন প্রকার পুণ্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে না পারায় আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন "আহা! কি দুর্দ্দৈব, আমার এক দিবস বৃথা নষ্ট হইল।" সেই রূপ আমাদিগের পুত্র কন্যার প্রতিপালন ও শিক্ষার ভার আমাদিগের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে; এবং তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত আমরা ঈশ্বরের নিকট দায়ী। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ এই যে গৃহস্থ স্বীয় পুত্রদিগকে বিদ্যাভ্যাস করাইবেক এবং কন্যাকেও অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক। সেই বিদ্যাভ্যাস এবং শিক্ষা কি তদ্বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে, যে ঈশ্বর-জ্ঞান ও ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্তি ব্যতিরেকে সেই বিদ্যাভ্যাস বা শিক্ষাকার্য্য কোন প্রকারেই সম্পন্ন হয় না। যে আর্য্য সন্তানেরা ধর্ম্মবিষয়ে দীক্ষিত না হইয়া পাঠাভ্যাস আরম্ভ করিতে পারিতেন না, ব্রহ্মচর্য্যই যে বিদ্যাভ্যাসের প্রারম্ভ, যে মহর্ষিরা ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ প্রভৃতিকে অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিয়া গণনা করিয়া-

ছেন, এবং যাঁহাদিগের মতে যদ্দ্বারা অক্ষর পুরুষকে জানা যায় কেবল তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিয়া পরিগণিত, যে আর্য্য ঋষিরা বলিয়াছেন যে যাহার দ্বারা আমরা অমর না হই তাহা লইয়া কি করিব? সেই মহর্ষিরা যখন পুত্র কন্যাকে বিদ্যাভ্যাস করাইবার ও শিক্ষা দিবার উপদেশ দিতেছেন তখন যে তাঁহারা ধর্ম্মোপদেশ ও যদ্দ্বারা ঈশ্বর-বিষয়ে জ্ঞান জন্মে ও সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায় তদ্বিষয়েই যে শিক্ষা দিবার জন্য আদেশ করিতেছেন তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। যে কালে এই সমস্ত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল সে সময়ে বিদ্যাভ্যাস ও শিক্ষাপ্রদান শব্দের অর্থেই ঈশ্বর-জ্ঞান ও ধর্ম্মশিক্ষা বুঝাইত। এবং জ্ঞানাপন্ন আচার্য্যের কর্ত্তব্যই এই ছিল যে "উপস্থিত শিষ্যকে সম্যক শান্ত শমান্বিত-চিত্ত দেখিয়া যে বিদ্যা দ্বারা অক্ষর সত্য পুরুষকে জানা যায়, তাহার উপদেশ করিবেন"। তৎকালে এই প্রকার ঋষিবাক্য অনুসারেই বিদ্যাভ্যাস হইত এবং বিদ্যাভ্যাস ধর্ম্মোপদেশের প্রতিবাক্য স্বরূপ ব্যবহৃত হওয়ায় শিক্ষার্থী মাত্রেই অন্যান্য বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রেষ্ঠ বিদ্যার আলোচনা করিতেন, অর্থাৎ যদ্দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায় তদ্‌বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত হইতেন, এবং জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্মোন্নতি হইতে থাকিত; অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা সমুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রেষ্ঠ বিদ্যার চর্চ্চা হইত। কিন্তু আমাদিগের আধুনিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিলে তাহার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় দেখা যায়। যাহাতে পুত্র কন্যার, অন্ততঃ পুত্রদিগের জ্ঞানোন্নতি হয়, যাহাতে তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি সমূহ মার্জ্জিত ও সম্যক রূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য অনেককেই বিশেষ যত্নবান্ দেখা যায়। কিন্তু কিসে তাহাদিগেরে ধর্ম্মোন্নতি সাধন হইবে—কি উপায়ে তাহারা ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করত প্রকৃত রূপে মনুষ্য-নামের যোগ্য হইবে, সে বিষয়ে প্রায় সকলেরই বিশেষ ঔদাস্য দৃষ্ট হয়। সন্তান সন্ততিদিগকে বিদ্যাভ্যাস করান পিতামাতার যে প্রকার কর্ত্তব্য, তাহাদিগকে নীতিশিক্ষা ও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান যে তদপেক্ষা সহস্র গুণে প্রয়োজনীয়, এবং তজ্জন্য যে তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট দায়ী তাহা কখন ভ্রমেও মনে করেন না। এবং এই প্রকার নিরীশ্বর শিক্ষার প্রভাবে আত্মার যে কতদূর অবনতি হয়, এবং জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মোন্নতির অভাবে দেশের যে কি বিষম অনিষ্ট হইতেছে, এবং তন্নিবন্ধন আমরা যে কি প্রকার গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইতেছি, কি ঘোরতর পাপে নিপতিত হইতেছি, তাহা ক্ষণমাত্রও কেহ চিন্তা করেন না। পুত্র কন্যাদিগের বিদ্যাশিক্ষার ভার পিতামাতার প্রতি এবং ঈশ্বর-জ্ঞান লাভের ভার তাহাদিগের নিজের প্রতি, এই ভ্রমাত্মক সংস্কার যাঁহাদিগের মনে দৃঢ়বদ্ধ আছে, এবং যাঁহারা সেই ভ্রমে মুগ্ধ হইয়া নিশ্চিন্ত থাকেন এবং পুত্রের মানসিক উন্নতি সম্পাদন করিতে পারিলেই আপনাদিগকে আপ্তকাম মনে করেন, এবং পুত্র কন্যাদিগের প্রতি এবং তজ্জনিত ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য সমস্ত সম্পন্ন হইল বিবেচনা করেন; তাঁহাদিগেরও জানা আবশ্যক যে ধর্ম্মশিক্ষা পুত্রের নিজের কর্ত্তব্য হইলেও যে পিতামাতা বাল্য কালে পুত্র কন্যাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান না করেন এবং যাহাতে ঈশ্বর-বিষয়ে জ্ঞান জন্মে এবং তাঁহার প্রতি পূর্ণ প্রীতি সংস্থাপিত হয় তজ্জন্য বিশেষ যত্নবান্ না হয়েন, তাঁহারা প্রকৃত রূপে পুত্রের ভাবি ধর্ম্মজ্ঞানের পথে কণ্টক রোপণ করেন; তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক এরূপ জঘন্য পাপে লিপ্ত না হইলেও তাঁহাদিগের

কার্য্যের দ্বারা এই বিষময় ফল উৎপন্ন হয়। কেননা যেমন সামান্য বিষয়ে আমরা জানি যে নূতন পাত্রে সংলগ্ন কলঙ্কের ন্যায় বাল্যকালের সংস্কার সহজে দূর হয় না; সদ্যোত্থিত যথেচ্ছ-গমনোন্মুখী লতিকাকে প্রথমতঃ যে দিকে নত করা যায় তাহা সেই দিকেই নত হয়, এবং তৎপরে তাহাকে দিগন্তরগামী করিবার চেষ্টা সহজে সুসিদ্ধ হয় না; সেইরূপ বালক বালিকাদিগকে প্রথম হইতেই ঈশ্বরের দিকে না লওয়াইলে প্রথম হইতেই তাহাদিগের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকলকে সবল না করিলে শেষাবস্থায় তাহাদিগের ধর্ম্মে মতি সহজে হয় না। এনিমিত্ত হৃদয়ে ঈশ্বর-প্রীতি প্রবল করা যদি সন্তান সন্ততিদিগের নিজের কার্য্য হয়, তাহা হইলেও প্রথমাবস্থাতে তাহাদিগের হৃদয়ে ধর্ম্ম ও প্রীতির বীজ বপন না হওয়ায় পরে তাহা তাহাদিগের পক্ষে যে প্রকার দুরূহ হয়, বয়োধিক্য নিবন্ধন হৃদয় শুষ্ক হওয়াতে নূতন বীজ অঙ্কুরিত হইতে না পারা প্রযুক্ত তাহাদিগের অবস্থা যে প্রকার শোচনীয় হইয়া পড়ে, তাহার জন্য কে দায়ী? যে ব্যক্তির সমস্ত ভার কিছু কালের নিমিত্ত আমার হস্তে ন্যস্ত ছিল, আমার ঔদাস্য প্রযুক্ত অবশেষে সে স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনে অক্ষম হইল, আমার দোষে সে প্রকৃত মনুষ্যত্ব হইতে বঞ্চিত হইল; এই ঘোরতর অপরাধের জন্য কে অপরাধী? যে পুত্র কন্যার সর্ব্ব প্রকার উন্নতি সাধনের ভার আমাতে অর্পিত হইয়াছিল আমার যত্নের অভাবে বা বুদ্ধির দোষে তাহারা পরম পিতা পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভে বঞ্চিত হইল—শারীরিক মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির সামঞ্জস্যের অভাবে অন্যান্য বৃত্তি প্রবল হইল এবং ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সমুদায় অসাড় ও নির্জ্জীব হইয়া পড়িল—ইহা অপেক্ষা আমার কর্ত্তব্য সাধনের ত্রুটি আর কিসে প্রতিপন্ন হয়? সন্তান সন্ততিদিগকে ধর্ম্মজ্ঞানে বঞ্চিত রাখিয়া কে বলিতে পারেন্ যে ঈশ্বরের প্রতি আমার কর্ত্তব্য সমূহ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে? এই নিমিত্ত আমাদিগের সকলেরই এই একটী প্রধান কর্ত্তব্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। ভারতে কৃতবিদ্য যুবকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে; বিদ্যা-চর্চ্চা সহকারে জ্ঞানালোচনা এবং মানসিক উন্নতি সাধনের বিশেষ সাহায্য হইতেছে; কিন্তু ধর্ম্মশিক্ষার অভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতির ব্যাঘাত জন্মিতেছে, এবং আত্মা ক্রমে জ্যোতিঃবিহীন ও ম্রিয়মান্ হইয়া পড়িতেছে। প্রথমাবস্থাতে ঈশ্বরের প্রতি আমাদিগের কর্ত্তব্য সমুদায়ের প্রতি, এবং সেই কর্ত্তব্য হইতে সমুদ্ভূত ও তাহার এক অঙ্গস্বরূপ সন্তান সন্ততিদিগের প্রতি আমাদিগের যে কর্ত্তব্য তৎপ্রতি, প্রথমাবস্থায় কিঞ্চিৎ দৃষ্টি রাখিলে এই দুরবস্থা সহজেই নিবারণ হইতে পারে। ঈশ্বর-প্রীতি এবং ধর্ম্মভাব সুকুমারমতি শিশুর সরল চিত্তে যে রূপ সহজে নিবিষ্ট হয়, শিশু-হৃদয়ে সেই ভাব সংস্থাপন করা যে প্রকার অনায়াস-সাধ্য, তাহাতে যদি আমরা প্রথম হইতেই চেষ্টা করি তাহা হইলে শিশুর আত্মায় পবিত্র ব্রহ্মমূর্ত্তি অনায়াসে অবিনশ্বর অক্ষরে অঙ্কিত হইতে পারে। এবং ঈশ্বর-প্রীতি একবার যাঁহার অন্তরে স্থান পাইয়াছে, ব্রহ্মোপসনার সুমধুর স্বাদ যিনি মুহূর্ত্ত মাত্রও গ্রহণ করিয়াছেন, মঙ্গলময়ের নিরুপম মঙ্গল ভাব প্রীতি-নেত্রে যিনি কখনও দর্শন করিয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি যাঁহার আত্মাকে ক্ষণমাত্রও প্রদীপ্ত করিয়াছে তিনিই জানেন যে সেই প্রীতি সেই জ্ঞান সেই জ্যোতিঃ কিছুতেই বিদূরিত হইতে পারে না। হিমালয় চূর্ণ

হইতে পারে, মহাসাগর সমস্ত শুষ্ক হইতে পারে, সূর্য্যের জ্যোতিঃ তমসাবৃত হইতে পারে, কিন্তু অবিনাশী আত্মার বিশ্বাস বা ঈশ্বর-জ্ঞান নষ্ট হইবার নহে ; ভক্ত-হৃদয়ের মধুরতা বা শান্তি-রস শুষ্ক হইতে পারে না ; ব্রহ্মজ্ঞান রূপ স্বর্গীয় অগ্নি কোন কালেই জ্যোতিঃহীন হইবে না ; শিশুর আত্মা প্রথম হইতে ধর্ম্মভাবে পূর্ণ হইলে তাহা কল্পান্তস্থায়ী হইবে এবং সেই জ্ঞান ইহ জীবনে আরম্ভ করিয়া অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তাহাকে ঈশ্বরের দিকে লইয়া যাইবে। আত্মার যেমন নাশ নাই, আত্মজ্ঞানেরও সেইরূপ শেষ নাই তাহা অবিনাশী অনন্ত-কাল স্থায়ী। পুত্র কন্যাদিগের প্রতি কর্ত্তব্য সাধনে যত্নবান হইয়া, আমরা কিসে তাহারা সংসারে মান মর্য্যাদা বা খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিবে, কিসে লোকের নিকট জ্ঞানবান ও বিদ্বান বলিয়া পরিচিত হইবে, কিসে সাংসারিক সুখসমৃদ্ধি লাভ করিবে কেবল সেই চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকি ; এবং কেবল সেই বিষয়েই কৃতকার্য্য হইতে পারিলে আপনাদিগকে আপ্তকাম মনে করি, এবং তাহাদিগের প্রতি আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদায় সুসম্পন্ন হইল বলিয়া মনকে স্তোভ দিই। কিন্তু যাহাতে তাহাদিগের যথার্থ উন্নতি—আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন হয়, যাহাতে তাহারা পরমার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, অথবা যাহাতে তাহারা প্রকৃত সুখ এবং অনন্ত জীবন লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য কেহই চেষ্টিত হয়েন না। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের চালনার অভাবে তাহাদিগের আত্মা যে নির্জ্জীব ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে তাহার প্রতি কেহই লক্ষ্য করেন না। মনোবৃত্তি সমুদায়ের স্ফূর্ত্তি লাভ এবং জ্ঞানোন্নতি যে নিতান্ত আবশ্যক তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না ; কিন্তু তাহার সহিত ধর্ম্মোন্নতির প্রভেদ এই যে যেমন পুষ্পের সৌন্দর্য্য ও সৌগন্ধ ; একাধারে যদি দুই গুণই প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা হইলে তদপেক্ষা বাঞ্ছনীয় আর কিছুই হইতে পারে না, কিন্তু দেখিতে মনোহর গন্ধ-বিহীন পুষ্প অপেক্ষা যেরূপ দৃষ্টি-কুৎসিৎ সুবাসিত পুষ্প অধিক আদরণীয়, সেই প্রকার অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন জ্ঞানবান ও বিদ্বান অথচ ধর্ম্মহীন পুরুষ অপেক্ষা ঈশ্বরপরায়ণ বিদ্যাবিহীন সাধু সর্ব্ববিধায়ে শ্রেষ্ঠ এবং অধিকতর আদরনীয়। এক্ষণে দেখা যাউক যে, যে উপায়ের দ্বারা বালক বালিকাকে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া যাইতে পারে তাহা এরূপ কঠিন এরূপ কষ্টসাধ্য কি না যে তাহা সহজে মনুষ্যের আয়ত্তাধীন হয় না। কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে সেই উপায় সমস্ত নিতান্ত সহজ এবং অনায়াস-সাধ্য। যে মানসিক জ্ঞানোন্নতির নিমিত্ত সকলেই ব্যস্ত, যে পার্থিব বিদ্যালাভের নিমিত্ত সকলেই লালায়িত, সেই জ্ঞানালোচনা সেই বিদ্যাচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে অনায়াসে ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞান এবং ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা যাইতে পারে। যাহারা পদার্থ বিদ্যার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছে জড় জগতের সৃষ্ট পদার্থ সকলের দোষ গুণ এবং কার্য্যকারিতার বিচার করিতেছে তাহাদিগকে সেই সঙ্গেই বুঝাইয়া দেওয়া যায় যে সেই সমস্তের যিনি স্রষ্টা তিনি সকল হইতে শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহার অখণ্ড নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া সমস্ত পদার্থ স্থিতি করিতেছে, এবং তাহাদিগের উপযোগিতার দ্বারা সেই সর্ব্বমঙ্গলময়ের পূর্ণ মঙ্গল স্বরূপের পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই সমস্ত জড় পদার্থের দ্বারা মনুষ্য কত প্রকারে উপকৃত হইতেছে বিজ্ঞানের সাহায্যে সেই সমস্ত পদার্থের দ্বারা তাবৎ জীবের এবং জন

সমাজের কত প্রকার উন্নতি সাধন হইতেছে, ইহা যখন বালক বালিকারা বুঝিতে পারে, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই জ্ঞানময়ের অনন্ত জ্ঞান, এবং যাবদীয় পদার্থকে মনুষ্যের উন্নতি সাধন এবং সুখসমৃদ্ধির উপায় করিয়া দেওয়াতে সেই করুণাময়ের অপার করুণার বিষয়, কত সহজে বালক বালিকার হৃদয়ঙ্গম করান যাইতে পারে। জ্যোতির্ব্বিদ্যা-শিক্ষার্থীরা যখন গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতির স্থিতি গতি ও পরস্পরের সম্বন্ধ দেখিয়া চমৎকৃত এবং পুলকে পূর্ণিত হয়, তখন যদি তাহাদিগের চিত্ত সেই বিশ্বস্রষ্টার অনন্ত কৌশলের প্রতি আকর্ষণ করা যায়, তখন যদি তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া যায় যে সেই জ্যোতির্ম্ময়ের জ্যোতির নিকট প্রভাকর প্রভাহীন হয়, তাঁহার অচিন্ত্য অত্যাশ্চর্য্য কৌশলেই গ্রহ নক্ষত্রাদি স্বস্ব পথে ভ্রমণ এবং নিজ নিজ স্থানে অবস্থিতি করিতেছে, এবং সমুদায় একীভূত হইয়া সেই ভূমা পরমেশ্বরের মহিমা প্রচার করিতেছে; তাহা হইলে কত সহজে তাহাদিগকে ঈশ্বর-চিন্তায় রত করা যাইতে পারে; এবং মনোবিজ্ঞানের অধ্যেতাদিগকে আরও কত সহজে ঈশ্বরের দিকে এবং ধর্ম্মপথে লওয়ান যাইতে পারে এবং এইরূপে জ্ঞানচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর-চিন্তা এবং ধর্ম্মশিক্ষা কত সুলভ হইয়া পড়ে। এইরূপ শিক্ষা-প্রণালীর বিষয় বিশেষ রূপে আলোচনা করিবার এ সময় নহে এবং আর অধিক দৃষ্টান্তের দ্বারা এ কথা প্রতিপন্ন করাও নিষ্প্রয়োজন; কেবল মাত্র ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এমন শাস্ত্র নাই যাহার অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর-জ্ঞানলাভের চেষ্টা না করা যায়—অধিক কি শাস্ত্র দূরে থাকুক, এই সংসারে এমন কোন পদার্থ নাই যাহা হইতে চেষ্টা করিলে আমরা ঈশ্বর-জ্ঞান লাভ করিতে বা ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইতে না পারি। কোন এক মহানুভব ঈশ্বর-পরায়ণ ধর্ম্মনিষ্ঠ কবির বিষয়ে ইহা কথিত আছে যে, তিনি স্বীয় পুত্রের মত ও মনের গতি নাস্তিকতার পক্ষপাতী দেখিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্ত হইলেন; এবং তাহাকে ঈশ্বরের দিকে আনিবার ও তাহার মত পরিবর্ত্তন করিবার অন্য কোন প্রকার সুযোগ না পাইয়া একটী সুকৌশল উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি দেখিলেন যে পুত্রের পুষ্পোদ্যানের প্রতি বিশেষ অনুরাগ আছে; এবং তাহা হইতে তাহার ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস সংস্থাপন করা সহজ হইবে; এই বিবেচনায় তিনি কতকগুলি পুষ্পশ্রেণী এই রূপে সাজাইলেন যে তাহাতে তাঁহার নাম পড়া যাইতে লাগিল। পরে এক দিবস তাঁহার পুত্রের সহিত সেই উদ্যানে ভ্রমণ করিতে আসিলে পুত্র পুষ্পশ্রেণী দেখিবামাত্র আশ্চর্য্য হইয়া কহিয়া উঠিল "ইহা কাহার রচনা"। পিতা উত্তর করিলেন যে, ইহা আপনা হইতেই ঐরূপ হইয়াছে। পুত্র তাহা নিতান্ত অসম্ভব বুঝিয়া যখন বার বার প্রশ্ন করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল যে, তাহা আপনা হইতে কখনই হইতে পারে না; নিশ্চয়ই কাহারও রচনা হইবে। তখন পিতা উত্তর করিলেন যে, যদি এই সামান্য রচনা-কৌশল দেখিয়া তোমার মনে হয় যে ইহা কখনই আপনা হইতে উদ্ভব হইতে পারে না; তবে এই বিশ্ব-সৃষ্টিতে যে অনন্ত কৌশল দেদীপ্যমান রহিয়াছে তাহা আপনা হইতে উদ্ভব হওয়া কি প্রকারে সম্ভব বিবেচনা কর। সেই অবধি পুত্রের জ্ঞান জন্মিল, এবং তিনি সৃষ্টির পদার্থ মাত্রেই ঈশ্বরের পবিত্র হস্ত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; এবং প্রত্যেক সামগ্রী হইতে বিশ্বপাতা জগৎপিতার অচিন্ত্য মহিমা, অনন্ত জ্ঞান, এবং অপার করুণার পরিচয় প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিলেন। আমরাও সেই রূপ যত্ন করিলে অতীব ক্ষুদ্র বিষয় হইতেও

পুত্র কন্যার ঈশ্বর-জ্ঞান জন্মাইয়া দিতে এবং তাহাদিগকে ধর্ম্মনিষ্ঠ ও পবিত্র করিতে পারি। কিন্তু এই প্রধান কর্ত্তব্য সম্পাদন —এই সাধু উদ্দেশ্য সুসিদ্ধির জন্য—একটি সার কথা আমাদিগের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, একটী মাত্র দৃষ্টান্তের দ্বারা যাহা সুসিদ্ধ হয় শত শত উপদেশেও তাহা সম্পন্ন হয় না। পিতা যখন পুত্রকে ধর্ম্ম-পথে—ঈশ্বরের দিকে লওয়াইতেছেন, তখন যদি তিনি নিজে সেই পথের পথিক না থাকেন, তিনি স্বয়ং যদি ঈশ্বরপরায়ণ না হন তবে তাঁহার চেষ্টা সমুদয় বিফল হইবে। অতএব যেন আমাদিগের নিজের হৃদয় সকল সময়ে সকল অবস্থায় ঈশ্বর-প্রীতিতে পূর্ণ থাকে; আমাদিগের আত্মাকে যেন কখন শুষ্ক হইতে না দিই; এবং স্বয়ং ধর্ম্মপরায়ণ ও শুদ্ধাচারী হইয়া যেন সন্তান সন্ততির শিক্ষাকার্য্যে প্রবৃত্ত হই। তাহা হইলে আমাদিগের সাধু দৃষ্টান্তের দ্বারা আমাদিগের উপদেশের গুরুত্ব প্রতিপন্ন হইবে, এবং সেই কারণে আমরা আমাদিগের উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য্য হইতে এবং আয়াস ও যত্নের সাফল্য লাভ করিতে সমর্থ হইব। কিন্তু যদি আমাদিগের উপদেশ এক প্রকার এবং কার্য্য অন্য প্রকার হয়—পুত্র কন্যা-দিগকে ঈশ্বরপরায়ণ হইতে বলি অথচ নিজে প্রীতিশূন্য হই—স্বয়ং ধর্ম্মপথ পরি-ত্যাগ করত সন্তান সন্ততিদিগকে ধর্ম্মনিষ্ঠ করিবার চেষ্টা পাই—সদুপদেশের খনি অসদ্দৃষ্টান্তের দ্বারা লোপ করি; তাহা হইলে আমাদিগের যত্ন ও চেষ্টা সমুদায়ই বিফল হইবে; উদ্দেশ্য যতই মহৎ, আশা যতই উচ্চ হউক না কেন, কার্য্য-দোষে সকলই হীন মলিন হইয়া পড়িবে; স্বয়ং মোহান্ধ হইয়া অন্যের পথপ্রদর্শক হইবার চেষ্টা করিলে উভয়েই দুস্তর ভ্রান্তি-সাগরে পতিত হইবে। অতএব যখন আমরা পুত্র কন্যার ধর্ম্মশিক্ষায় প্রবৃত্ত হই, যখন তাহাদিগের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিবার চেষ্টা করি, যখন তাহাদিগকে সত্যের পথে ঈশ্বরের পথে লইয়া যাইবার নিমিত্ত সচেষ্ট হই; তখন যেন নিজের প্রতি দৃষ্টি থাকে; যেন স্বয়ং শান্ত শমান্বিতচিত্ত হইয়া পুত্র কন্যার শিক্ষার ভার গ্রহণ করি, এবং স্বীয় আত্মাকে ঈশ্বর-ভাবে পূর্ণ করিয়া পবিত্র হৃদয়ে, প্রীতি সহকারে সেই পূর্ণ-মঙ্গল জগৎ-প্রসবিতা পরম দেবতার অসীম মহিমা, অনন্ত জ্ঞান এবং অপার করুণার বিষয়ে তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করি। এবং স্বয়ং ধর্ম্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া সন্ততির ধর্ম্মোন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হই।

পুত্র কন্যার বিদ্যাভ্যাস ও ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে যাহা কথিত হইল; তাহাতে অনেকে মনে করিতে পারেন যে পুত্র সম্বন্ধে এই সমস্ত কথা প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করা যা-ইতে পারে, কিন্তু কন্যা সম্বন্ধে তাহা প্রয়োগ করা যায় না। মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে নর নারীর যে সমান অধিকার সে বিষয় তর্কের দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা এক্ষণে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আমরা এই বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছি, তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিয়া দেখিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে ব্রাহ্মধর্ম্মে পুত্র কন্যা সম্বন্ধে কিছুই ইতর বিশেষ নাই। যেমন পুত্রদিগের বিদ্যা-ভ্যাস অর্থাৎ জ্ঞান ও ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে পিতা মাতার কর্ত্তব্য অবধারিত হইয়াছে; সেই রূপ তাহার সঙ্গে সঙ্গেই কথিত হই-য়াছে যে "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া" কন্যা-কেও এইরূপে পালন করিবেক এবং "শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ অতিযত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক। ইহাতে পুত্রের শিক্ষা এক প্রকার এবং কন্যার শিক্ষা ভিন্ন প্র-কার এরূপ কোন প্রভেদ করা হয় নাই। বরং যে ব্রাহ্মধর্ম্মে "দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা" কন্যাকে "ধনরত্নের সহিত সুপণ্ডিত পাত্রে সম্প্রদান" করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, এবং তাহা পিতা মাতার অবশ্য কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে; তাহাতেই দেখিতে পাই যে "নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্" "কন্যা যত দিন ধর্ম্মশাসন অজ্ঞাত থাকে তত দিন পিতা তাহার বিবাহ দিবেন না" ইহার দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে কন্যার শিক্ষা সম্বন্ধে তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা পিতা মাতার যে প্রধান কর্ত্তব্য পুরাকালীন

মহর্ষিরা তাহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন। কিন্তু যদি ঋষিবাক্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াও বিবেচনা করা যায়, যদি কেবল মাত্র যুক্তির পথ অবলম্বন করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলেও কন্যাদিগকে নীতিশিক্ষা প্রদান এবং তাহাদিগের ধর্ম্মোন্নতি সাধন পিতা মাতার প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিশেষ রূপে সাব্যস্ত হইবে। যে বিষয় যাহার উপযোগী তাহাকে সেই বিষয়ে নিয়োগ করাই যুক্তির পথ, এবং উপযুক্তের উপযোগিতা সম্পাদনই বিশ্বময়ের বিশ্বভাণ্ডারের অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় কৌশল। যদি আমরা সেই যুক্তি এবং বিশ্ববিধাতার সেই অখণ্ড নিয়মের প্রতি দৃষ্টি করি, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিব যে যখন পবিত্র প্রীতি নারী-হৃদয়ের যে প্রকার নিরুপম শোভা সম্পাদন করে প্রীতির এরূপ অসামান্য সৌন্দর্য্য আর কিছুতেই দৃষ্ট হয় না; অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, প্রগাঢ় ভক্তি এবং অটল বিশ্বাস রমণীর অন্তরে যেরূপ দৃঢ় নিবদ্ধ হয় এরূপ পুরুষের আত্মাতে প্রায় দেখা যায় না; তখন ইহা স্পষ্ট অনুভূত হয় যেন করুণাময় পরমেশ্বর স্ত্রীজাতির আত্মা ঈশ্বর-ভাবের প্রকৃত আধার রূপে সৃষ্টি করিয়া তাহাকে ধর্ম্মোন্নতি সাধনের যথার্থ উপযোগী করিয়াছেন। অতএব আমরা পুত্রদিগের বিদ্যাভাস ও ধর্ম্মশিক্ষার প্রতি মনোযোগী হইয়া যেন কন্যা সন্তানদিগকে বিস্মৃত না হই, একের প্রতি কর্ত্তব্য সাধনে যত্নবান্ হইয়া যেন অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদনের ব্যাঘাত না জন্মাই। কিন্তু যেন আমরা সকল সময়ে সকল অবস্থাতে উভয়ের প্রতি সমভাবে সমানরূপে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইয়া উভয়কেই ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করত পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বব্যাপিতা ও উদারতা প্রতিপন্ন করি; এবং ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমস্ত সুচারু রূপে সম্পন্ন করিয়া প্রকৃত ব্রাহ্ম নামের যোগ্য হই।

ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ! আমরা ঈশ্বর-প্রসাদে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দিন দিন যে সমস্ত উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছি; অহোরাত্র যে সত্যের শিক্ষা পাইতেছি, যেন কার্য্যের দ্বারা তৎসমুদায়কে নষ্ট না করি। যেন আমাদিগের শিক্ষা ও উপদেশ এক প্রকার, এবং কার্য্য ও ব্যবহার অন্য প্রকার না হয়। ঈশ্বরের প্রতি আমাদিগের কি কর্ত্তব্য তাহা জ্ঞাত হইয়াও যেন আমরা কর্ত্তব্যবিমূঢ় না থাকি। অনেক সময়ে আমরা মনে করি যে কর্ত্তব্য নির্ব্বাচন অতি সহজ, কিন্তু তাহার অনুষ্ঠান নিতান্ত কঠিন; এবং এই ব্রাহ্মানুচিত, ধর্ম্মবিরুদ্ধ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য হইতে বিরত থাকি, এবং সময়ে সময়ে এতদূর নিশ্চেষ্ট এবং কর্ত্তব্যবিমূঢ় হই যে অতি সুলভ ও অনায়াসসাধ্য কর্ত্তব্য সাধনেও আমাদিগের ঔদাস্য দৃষ্ট হয়। করুণাময় পরমেশ্বর কর্ত্তব্যানুষ্ঠান আমাদিগের পক্ষে কি এতই কঠিন এরূপ দুঃসাধ্য করিয়াছেন যে আমরা বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য করিতে কখনই সমর্থ হইব না; ভক্তবৎসল ভগবান্, স্নেহময়ী জননী সন্তানদিগের পক্ষে ধর্ম্মপথ কি এতদূর ভয়ানক কণ্টকাবৃত করিয়াছেন, তাঁহার নিকট গমন করিবার সোপান কি এরূপ দুরারোহ ও সঙ্কীর্ণ করিয়াছেন যে ইচ্ছা করিলে এবং প্রকৃতরূপে সচেষ্ট হইলেও তাঁহার পথের পথিক হইতে পারিব না? ইহা কখনই সম্ভবে না; এ কথা নিতান্ত অবিশ্বাসীর চিত্তমুগ্ধকর স্তোভ বাক্য। ইহা মনে করিলে পরম করুণাময়ের অপার করুণার প্রতি দোষারোপ করা হয়, কোন ব্রাহ্মই সর্ব্বমঙ্গলময়ের মঙ্গলস্বরূপের এ প্রকার অপভ্রংশের অনুমোদন করিতে পারেন না। অতএব আমরা এ প্রকার ধর্ম্মবিরুদ্ধ কথায় কর্ণপাত করিবার পূর্ব্বে যেন স্বীয় অন্তরের প্রতি বিশেষরূপে দৃষ্টি করি এবং আপন আপন আত্মার প্রকৃত পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হই; এবং তাহা হইলেই দেখিতে পাইব যে কর্ত্তব্য সাধনের প্রকৃত কাঠিন্য কিছুই নাই; কেবল যত্নের অভাবে চেষ্টার অভাবে আমরা কর্ত্তব্য সাধনে বিরত থাকি। কিন্তু যদি আমাদিগের চেষ্টার ও প্রকৃত যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি না থাকে তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে কর্ত্তব্যসম্পাদনের ন্যায় সহজ কার্য্য আর কিছুই নাই। ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ! ঈশ্বর-প্রীতি যাহাদিগের সমস্ত চিন্তা ও কার্য্যের উদ্বোধক, পরম পিতার প্রিয় কার্য্য সাধন যাহাদিগের

প্রকৃত উদ্দেশ্য, ঈশ্বর তাহাদিগের সহায়, সেই বিশ্বনিয়ন্তা তাহাদিগের নেতা, এবং এই উচ্চ উন্নত সহায়তা যিনি প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার পক্ষে কিছুই কঠিন বোধ হয় না। অতএব ভ্রাতৃগণ, আর নিশ্চেষ্ট থাকিবার সময় নাই; এই উপস্থিত মহোৎসব হইতেই দেখিতে পাই যে ঈশ্বর যাঁহাদিগের সহায় তাঁহারা কত প্রকার বাধা ও বিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনে ও ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনে কৃতকার্য্য হইতেছেন। ঊনপঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে একটী মাত্র ব্রাহ্মসমাজেও লোকে নিয়মিত রূপে উপস্থিত হইতে সাহসী হইত না; এবং যদিও আমাদিগের আশানুরূপ পূর্ণ ফল এ পর্য্যন্ত ফলিয়া না থাকে, তাহা হইলেও এক্ষণে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে যে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত দেখিতেছি, এক্ষণে ভারতের এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে যে পর ব্রহ্মের স্তুতিবাদ হইতেছে, ইহাতে কাহার মন আশা এবং আনন্দে পরিপূর্ণ না হয়। এক্ষণে যে ব্রহ্মপূজার মন্দির কেবল মাত্র স্থানে স্থানে দৃষ্ট হইতেছে তাহা যে অচিরে গৃহে গৃহে দেখিতে পাইব অন্তরের এই চিরপোষিত প্রবল আশার বেগ কে নিবারণ করিতে পারে? কিন্তু আমাদিগের আয়াস ও যত্নের নিতান্ত প্রয়োজন; এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের যে উপদেশ অবলম্বন করিয়া আমরা পুত্র কন্যার প্রতি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিলাম; সেই উপদেশানুসারে কার্য্য করিলে প্রতি গৃহে অতি অল্পদিনের মধ্যে প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে ঈশ্বরপূজার মন্দির সংস্থাপিত হইবে। অতএব ভ্রাতৃগণ! সংশয় শঙ্কা বিরহিত হইয়া ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করত স্বীয় কর্ত্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত হও। ঈশ্বরকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই আমাদিগের একমাত্র কার্য্য জানিয়া, সেই পূর্ণ প্রীতিতে আত্ম সমাধান কর; পরমাত্মাতে প্রাণ মন ও আত্মা সমুদয় সমর্পণ করত অনন্ত জীবন ও প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বজনীনতা ও উদারতা প্রতিপাদন কর; এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতি সহকারে চির দিন, প্রতি মুহূর্ত্ত সেই করুণাময়ের সেবায় রত থাকিয়া যাহাতে সকলে সেই অমৃতের পরম সেতু প্রাপ্ত হয় তজ্জন্য যত্নবান্ হও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য	...	৩ .
পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক মূল্য	...	৪৷৷০
ডাক মাশুল (অগ্রিম দেয়)	...	।৵০

ছয় মাসের মধ্যে এক কালে অগ্রিম মূল্য না দিলে পশ্চাদ্দেয় হিসাবে মূল্য গৃহীত হইবে।

আয় ব্যয়

পৌষ ১৮০০ শক।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	...	২ ৫ ৭ ৷৷৶০
পূর্ব্বকার স্থিত		...	১ ৪ ৫ ।৶৫
সমষ্টি			৪ ০ ৩ ৵৫
ব্যয়	...	...	২ ৫ ২ ৸/০
স্থিত	...	...	১ ৫ ০ ।/৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	...	৩৷৷০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা		...	...	৪ ৮ ৸ ১০
পুস্তকালয়	...	...	...	৩ ৷৷৵১০
যন্ত্রালয়	...	...	...	১ ৮ ৪
গচ্ছিত	...	...	...	১ ৭ ৸০
সমষ্টি		...	...	২ ৫ ৭ ৷৷৶০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	...	৬ ৭ ৸৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা		...	...	৯ ৬ ৵৫
পুস্তকালয়	...	...	...	১ ৮ /১০
যন্ত্রালয়		...	...	৬ ৮ ৸ ৫
গচ্ছিত	...	...	...	১ ৸৵০
সমষ্টি		...	...	২ ৫ ২ ৸/০
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়		...	...	৩৷৷০

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১৯ ফাল্গুন রবিবার বর্দ্ধমান ব্রাহ্ম সমাজের ঊনবিংশ সাম্বৎসরিক মহোৎসব হইবে।
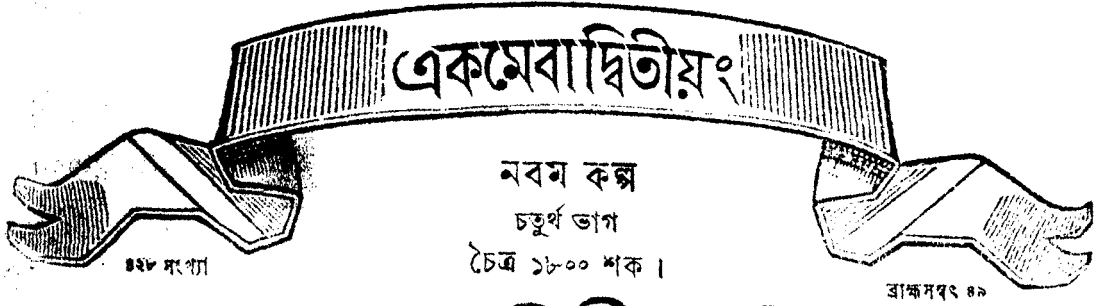
শ্রীঅম্বিকাচরণ সরকার।
সম্পাদক।

সম্বৎ ১৯৩৫। কলিগতাব্দ ৪৯৮০। ১ ফাল্গুন বুধবার।

Registerd No 52.

নবম কল্প

চতুর্থ ভাগ

৪২৮ সংখ্যা চৈত্র ১৮০০ শক। ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৯

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

রাগ ভৈরব—তাল ঝাঁপতাল।

প্রভু পূজিব তোমারে বড় আছে আকিঞ্চন,
হৃদয় কপাট খুলি পেতেছি মন আসন।
ভক্তির গেঁথেছি হার দিব আজি উপহার,
প্রেমের চন্দন ছিটা এই মাত্র আয়োজন।
নয়নের অশ্রু দিয়ে ধোব হে তব চরণ,
জানি তুমি দয়াময় ভক্তে দিবে দরশন।
এসো তবে দীনবন্ধু এসো করুণার সিন্ধু,
বিতরি প্রসাদবিন্দু সফল কর জীবন।

উপদেশ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৫ই ফাল্গুন, ১৮০০ শক।

"তুমি প্রাতঃকালের ন্যায় আর আমি নির্জ্জনাগারের প্রাতঃকালের বর্ত্তিকা স্বরূপ। তুমি একবার হাস্য কর এবং দেখ কিরূপ আমি তোমার জন্য প্রাণ সমর্পণ করি।"

ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে কবিরা অতি সহজে সত্য দৃষ্টি করেন এবং তাহা দৃষ্টি করিয়া এমন ভাষায় ব্যক্ত করেন যে তাহা শুনিবামাত্র মনুষ্যের আত্মা তৎক্ষণাৎ তাহাতে সায় দেয়। ধর্ম্মোপদেশক পণ্ডিত সহস্র প্রমাণ-প্রয়োগ ও সহস্র যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা যে সত্য আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইতে চেষ্টা করেন কবি তাহা এক কথায় আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেন। যে কবি হইতে আমি এই মাত্র বাক্য উদ্ধৃত করিলাম, সেই অত্যদ্ভুত কবি ঈশ্বর-প্রেমে গদগদ হইয়া ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া এমন একটি কথা বলিয়াছেন যাহা কেহ কখন বলে নাই। "তুমি প্রাতঃকালের ন্যায়।" প্রাতঃকাল আমাদিগকে ঈশ্বরের জ্যোতিঃস্বরূপ, অনন্তত্ব, পবিত্র স্বরূপ, শান্ত স্বরূপ, সুন্দর স্বরূপ, অন্তঃস্নিগ্ধকারিণী শক্তি এবং নবজীবন-প্রদায়িনী শক্তি, স্মরণ করাইয়া দেয়।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রাতঃকালের শুভ্র জ্যোতি ঈশ্বরের জ্যোতিঃস্বরূপকে স্মরণ করাইয়া দেয়। ঈশ্বর জ্যোতিঃস্বরূপ। তাঁহার জ্যোতি চর্ম্ম-চক্ষু দর্শন করিতে সক্ষম হয় না। তিনি জ্যোতির জ্যোতিঃ। জ্যোতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইতেছে। তিনি সকল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের আশ্রয়। "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

প্রাতঃকালের শুভ্র জ্যোতি অনন্ত আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া অনন্তরূপে প্রকাশ পায়। প্রাতঃকালের শুভ্র জ্যোতির অনন্ত ভাব ঈশ্বরের অনন্ত ভাবকে স্মরণ করাইয়া দেয়। ঈশ্বর সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি আকাশের অতীত হইয়াও স্থিতি করিতেছেন। তিনি বিশ্বকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন। "বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং।" জগৎকে ব্রহ্মমন্দির বলা উচিত হয় না তাহা হইলে ঈশ্বর জগতের দ্বারা ব্যাপ্য এইরূপ বুঝায় বরং ঈশ্বর জগতের মন্দির বলিলে শোভা পায়। ঈশ্বর যেমন অনন্ত-দেশ-ব্যাপী তেমনি অনন্ত-কাল-স্থায়ী, তাঁহার শক্তি অনন্ত, জ্ঞান অনন্ত, করুণা অনন্ত। ঈশ্বরের অনন্তত্বে বিশ্বাস ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ, এই বিশ্বাস সঙ্কুচিত হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম পৌত্তলিক ভাবাপন্ন হয়।

প্রাতঃকালের পবিত্রতা ঈশ্বরের পবিত্র স্বরূপকে স্মরণ করাইয়া দেয়। ঈশ্বর পবিত্র স্বরূপ। আমরা যেমন কখন সাধু, কখন অসাধু, ঈশ্বর সেরূপ নহেন। "ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্ নো এব অসাধুনা কনীয়ান্" সাধু কর্ম্মে তিনি শ্রেষ্ঠ হয়েন না আর অসাধু কর্ম্মে তিনি অশ্রেষ্ঠ হয়েন না। সাধু অসাধু শব্দ তাঁহাতে খাটিতে পারে না। তিনি সর্ব্বদাই পবিত্র স্বরূপ। তিনি যেমন নিজে পবিত্র স্বরূপ তেমনি অন্যকেও তিনি পবিত্র করেন। তাঁহাকে চিন্তা করিলে আমরা পবিত্র হই; তাঁহার প্রসঙ্গ করিলে আমরা পবিত্র হই; তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিলে আমরা পবিত্র হই।

প্রাতঃকালের প্রশান্ত ভাব ঈশ্বরের সেই শান্ত স্বরূপকে স্মরণ করাইয়া দেয়। আমাদিগের চিত্তের উপর রিপু সকল নিরঙ্কুশ আধিপত্য করিতেছে; তাহারা আমাদিগের হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করিতেছে; কিন্তু রিপু সকল তাঁহার প্রতি আধিপত্য করিতে পারে না। পাপ-প্রবৃত্তি আমাদিগের শান্তিভঙ্গ করিতেছে, দুঃখ ক্লেশ আমাদিগের শান্তিভঙ্গ করিতেছে, কিন্তু পাপ-প্রবৃত্তি এবং দুঃখ ক্লেশ তাঁহার প্রতি আধিপত্য করিতে পারে না। নানা কারণ বশতঃ আমাদিগের চিত্তের বিক্ষেপ ও চাঞ্চল্য হইতেছে; তাঁহার এরূপ চাঞ্চল্য নাই। তিনি নিস্তরঙ্গ অতি গম্ভীর সমুদ্রবৎ প্রকাশ পাইতেছেন। ঈশ্বর যেমন নিজে শান্ত স্বরূপ, তিনিই কেবল আমাদিগকে শান্তি প্রদান করিতে পারেন। শান্তির জন্য ধনের দ্বারে উপনীত হও, ধন এই কথা বলিবে "পৃথিবীর স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা তোমাকে দিতে পারি, তোমার সম্বন্ধে পৃথিবীকে সকল বিত্ত দ্বারা পূর্ণ করিতে পারি, কিন্তু শান্তি-রত্ন তোমাকে প্রদান করিতে অক্ষম।" শান্তির জন্য মানের দ্বারে উপনীত হও, মান তোমাকে এই কথা বলিবে "তোমাকে সর্ব্বোচ্চ পদ প্রদান করিতে পারি, সংসারের সকল ব্যক্তিকে তোমার পদতলে আনয়ন করিয়া দিতে পারি, কিন্তু শান্তি প্রদান করিতে পারি না।" শান্তির জন্য যশের দ্বারে উপনীত হও যশ তোমাকে এই কথা বলিবে "আমি এমন করিতে পারি যে সমস্ত পৃথিবী তোমার খ্যাতিরবে নিনাদিত হইবে, সকলেই তোমার কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিবে কিন্তু শান্তি প্রদান করিতে সক্ষম নহি।" এই রূপে শান্তি লাভ না করিয়া আমরা সকল দ্বার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করি। সাংসারিক দুঃখ ক্লেশে ম্রিয়মাণ হইয়া আমরা শান্তিকে আহ্বান করি কিন্তু শান্তি আগমন করে না।

"অধীর হইয়া হেন উপদ্রবে
শান্তি শান্তি করি হৃদয় সদা ডাকে আর্ত্তরবে।
শান্তি মনে করি অশান্তিরে ধরি
চাই এক পাই আর এ বিচিত্র ভবে॥"

সংসারানলে দীপ্তশিরা হইয়া আমরা যেখানে গমন করি না কেন, কোন খানেই শান্তি লাভ করিতে সক্ষম হই না, কেবল ঈশ্বরের নিকট গমন করিলে শান্তি লাভ করিতে সক্ষম হই।

প্রাতঃকালের সৌন্দর্য্য ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যকে স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রাতঃকালের নিষ্কলঙ্ক পবিত্র সৌন্দর্য্য ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক পবিত্র সৌন্দর্য্যকে স্মরণ করাইয়া দেয়। সে সৌন্দর্য্য চিন্তা করিলে মন মোহিত হয়। জগতে অনেক সুন্দর পদার্থ আছে কিন্তু সেই রূপহীন সৌন্দর্য্যের নিকট রূপবিশিষ্ট সৌন্দর্য্য একেবারে পরাভব মানিয়াছে।

প্রাতঃকাল স্নিগ্ধকাল। প্রাতঃকালে স্বভাবতঃ রিপুর উত্তেজনা ও পীড়ার যাতনা অপেক্ষাকৃত প্রশমিত হয়। প্রাতঃকালের স্নিগ্ধ ভাব ঈশ্বরের অন্তঃস্নিগ্ধকারিণী শক্তি স্মরণ করাইয়া দেয়। ঈশ্বরকে চিন্তা করিলে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ হয়, প্রাণ মন শীতল হয়। অন্তঃশীতলতার প্রতি সুখ নির্ভর করে। অন্তর যদি শীতল থাকে তবে সমস্ত জগৎ শীতল বোধ হয় আর অন্তর যদি উত্তপ্ত থাকে তবে সমস্ত জগৎ উত্তপ্ত বোধ হয়।

"অন্তঃশীতলতায়াং হি লব্ধায়াং শীতলং জগৎ।
অন্তস্তাপাভিতপ্তানাং দাবদাহময়ং জগৎ॥"

প্রাতঃকাল ঈশ্বরের নব-জীবন-প্রদায়িনী শক্তিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রাতঃকালে যেমন মনুষ্য মৃত্যুর প্রতিরূপ নিদ্রা হইতে জাগরিত হয় তেমনি ঈশ্বর-প্রসাদাৎ আত্মা মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হয়। রজনীর অন্ধকারের অবসানে যেমন জগৎ আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হয় তেমনি ঈশ্বর-প্রসাদাৎ আত্মার জাগরণের পর অজ্ঞানান্ধকার তিরোহিত হইলে ও জ্ঞানচক্ষু স্ফূর্ত্তি পাইলে, ঈশ্বর আমাদিগের নিকটে প্রকাশিত হয়েন। প্রাতঃকালে যেমন জীব সকল নব জীবন লাভ করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তেমনি ঈশ্বর-প্রসাদাৎ আত্মা উল্লিখিত আধ্যাত্মিক প্রাতঃকালে নব জীবন লাভ করিয়া ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হয়।

কবি বলিতেছেন "তুমি প্রাতঃকালের ন্যায় আর আমি নির্জ্জনাগারের বর্ত্তিকা স্বরূপ। তুমি একবার হাস্য কর ও দেখ কিরূপ আমি তোমার জন্য প্রাণ সমর্পণ করি।" ঈশ্বরের নিকট নম্রতা স্বীকার ও তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ তাঁহার প্রতি আমাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য। "আমি নির্জ্জনাগারের বর্ত্তিকা স্বরূপ" এই বাক্য দ্বারা কবি ঈশ্বরের নিকট নম্রতা স্বীকার করিতেছেন আর "তুমি একবার হাস্য কর আর দেখ আমি কিরূপ তোমার জন্য প্রাণ সমর্পণ করি" এই বাক্য দ্বারা তিনি ঈশ্বরকে আত্ম সমর্পণ করিতেছেন।

প্রাতঃকালের আলোকে যেমন বর্ত্তিকার আলোক ম্লান ও নিষ্প্রভ হয় তেমনি ঈশ্বরের জ্যোতির সহিত তুলনা করিলে শরীররূপ নির্জ্জনাগারের বর্ত্তিকা স্বরূপ আত্মার জ্যোতি ম্লান ও নিষ্প্রভ বোধ হয়। চন্দ্রের জ্যোতিতে যেমন খদ্যোতের জ্যোতি বিলুপ্ত হয় তেমনি ঈশ্বরের জ্যোতিতে আত্মার জ্যোতি হারাইয়া যায়। ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যের সহিত তুলনা করিলে আত্মাকে কি অধম বোধ হয়! তিনি কি প্রভাবশালী, দীপ্তিবিশিষ্ট ও সুন্দর! আমরা কি দীন হীন ও মলিন!

কবি তৎপরে শুভ্র পবিত্র প্রাতঃকালের সৌন্দর্য্যের ন্যায় ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া ও ঈশ্বর-প্রেমে গদগদ হইয়া তিনি এক্ষণে ঈশ্বরকে আত্মার্পণ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, "তুমি একবার হাস্য কর

এবং দেখ কিরূপ আমি তোমার জন্য প্রাণ সমর্পণ করি।” ঈশ্বরের হাস্য, ঈশ্বরের প্রসন্ন বদন, সাধকের একমাত্র ধন। সেই প্রসন্ন বদন ধার্ম্মিককে সংসারের সকল দুঃখ ক্লেশ সহ্য করিতে সক্ষম করে। মনে কর কোন ধনাঢ্য ধার্ম্মিক সম্পদ-ভ্রষ্ট হইয়া দরিদ্রাবস্থায় পতিত হইয়াছেন। তিনি দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যায় শয়ন করিতেন, এক্ষণে মৃত্তিকা তাঁহার শয্যা হইয়াছে, পৃথিবীর পরম উপাদেয় দ্রব্য সকল আহার করিতেন, এক্ষণে শাকান্ন আহার করিতে বাধ্য হইতেছেন, পূর্ব্বে অসংখ্য দাস দাসী দ্বারা সেবিত হইতেন, এক্ষণে আবশ্যক কর্ম্ম সকল অতি কষ্ট করিয়া নিজের হস্তে সম্পাদন করিতেছেন, তাঁহার অবস্থা এই রূপ হইলেও তাঁহাকে দরিদ্র মনে করিও না, তিনি এখনও সম্পূর্ণ ধনবান, তাঁহার নিকট এখনও এমন একটি ধন আছে যাহা চোর অপহরণ করিতে পারে না এবং যাহার উপর কাল আপনার প্রভাব প্রকাশ করিতে পারে না। এরূপ অবস্থাতেও তিনি ঈশ্বরকে বলেন “তুমি একবার হাস্য কর এবং দেখ কিরূপ আমি তোমার জন্য প্রাণ সমর্পণ করি।” উল্লিখিত দারুণ ক্লেশের অবস্থায় পতিত হইলেও উক্ত কথা বলিলে তাহা অতিরিক্ত বোধ হয় যেহেতু দরিদ্রাবস্থা দ্বারা সহসা লোকের প্রাণ বিনষ্ট হয় না কিন্তু যদি এমনই হয় যে প্রকৃতরূপে ধর্ম্মের জন্য তাঁহাকে প্রাণ হারাইতে হয় তথাপি তিনি মৃত্যু হইতে পরাঙ্মুখ হয়েন না। যদি ধর্ম্ম জন্য নিষ্ঠুর রাজা কর্ত্তৃক তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয় এবং তজ্জন্য তিনি বধ্যভূমিতে আনীত হয়েন তখন তিনি উক্ত কথা সম্পূর্ণরূপে সার্থক করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয়েন না। “তুমি একবার হাস্যকর ও দেখ কিরূপ তোমার জন্য আমি প্রাণ সমর্পণ করি।” বস্তুতঃ ধার্ম্মিক ব্যক্তির সম্বন্ধে এই ভৌতিক জীবন জীবন নহে। ঈশ্বর-প্রীতিই তাঁহার জীবন, ঈশ্বর-বিস্মরণই তাঁহার মৃত্যু। ঈশ্বরই তাঁহার আত্মার এক মাত্র আশ্রয়-ভূমি। বৃক্ষ কি কখন মূল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে, না নদী প্রস্রবণ হইতে পৃথক হইয়া প্রবাহিত হইতে পারে? বৃক্ষ যেমন মূল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না, নদী যেমন প্রস্রবণ হইতে বিযুক্ত হইয়া প্রবাহিত হইতে পারে না তিনি তেমনি ঈশ্বর হইতে পৃথক থাকিতে পারেন না। সাধক এই রূপ ঈশ্বর-গত-প্রাণ হইয়া সর্ব্বদাই গভীর আনন্দ উপভোগ করেন। কোন বিপদই সে আনন্দ ক্ষুব্ধ করিতে পারে না।

এরূপ অবস্থা কি প্রার্থনীয় নহে? কিন্তু এরূপ অবস্থায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য কেবল একটি মাত্র নিয়ম পালন আবশ্যক করে, সে নিয়ম নিষ্পাপ হওয়া। নিষ্পাপ হও আর আনন্দের আপন এই জগতের সমস্ত আনন্দ অবাধে লুণ্ঠন কর। যদি আমরা নিষ্পাপ হইতে পারিলাম তবে আর আমাদিগকে কে পায়?

হে পরমাত্মন্! হে জীবন-সমুদ্রের ধ্রুব তারা! তুমি যেন আমাদিগের দৃষ্টিপথের কখন অন্তর্হিত না হও। তোমার প্রসন্ন বদনই আমাদিগের একমাত্র ধন। তাহা আমাদিগের হইতে কখন লুক্কায়িত রাখিও না, তাহা হইলে আমরা সকলই হারাই। হে সৌন্দর্য্যের আধার ও একমাত্র প্রেমাস্পদ! আমরা যেন অন্তরের সহিত বলিতে পারি “তুমি হাস্য কর এবং দেখ কিরূপ আমি তোমার জন্য প্রাণ সমর্পণ করি।”

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা।

আমরা আনন্দিত চিত্তে পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের নিকট ব্রাহ্মদিগের অশেষ ঋণভার ব্রাহ্মেরা যে বিস্মৃত নহেন, তাঁহারা সম্প্রতি তাহার দেদীপ্যমান প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রচারিত বিজ্ঞাপনানুসারে ৭ ই মাঘ অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় ভক্তিভাজন প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বিস্তীর্ণ গৃহপ্রাঙ্গণে উক্ত মহাত্মার স্মরণার্থ একটী সভা হইয়াছিল। সভাস্থলে প্রায় সহস্রাধিক লোকের সমাগম হয়। ইহার মধ্যে বিস্তর বিদ্বান ধার্ম্মিক ও উচ্চপদস্থ লোক ছিলেন। সকলে সভাস্থলে উপবিষ্ট হইয়া উৎসাহপূর্ণ চক্ষে বক্তার প্রতীক্ষা করিতেছেন ইত্যবসরে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর উত্থিত হইয়া জ্বলন্ত উৎসাহ ও অনুরাগের সহিত কহিলেন—

প্রকৃত প্রস্তাব আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আমি এই একটি কথা বলিতে চাই যে, আমি কোন দলবদ্ধ সমাজ-বিশেষের প্রতিনিধি হইয়া অথবা তৎকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া অদ্যকার এই সভা আহ্বান করি নাই; রামমোহন রায়ের নাম-মাহাত্ম্য নির্ব্বিশেষে সকল ব্রাহ্মের গৌরবস্থল, এবং তাহার গুণে ব্রাহ্মেরা আধুনিক বিবাদ বিসম্বাদ বিস্মৃত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের পুরাতন অথচ চির নূতন—সনাতন যে একটি ভাব তাহা হৃদয়ঙ্গম পূর্ব্বক সকল প্রকার মনোমালিন্য এবং হৃদয়বেদনা ধৌত করিয়া ফেলিবেন, এই আশাতে উৎসাহিত হইয়া আমি অদ্যকার এই শুভ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি ঈশ্বর করুন যেন তাহা সফল হয়।

রামমোহন রায় সেই শ্রেণীর ব্যক্তি যাঁহারা পৃথিবী হইতে অবসৃত হইলেও স্বদেশের হৃদয় হইতে অবসৃত হন না, তাহা শুধু নহে—স্বদেশের হৃদয়ে দিন দিন ক্রমশই বদ্ধমূল হইতে থাকেন—তাঁহাদের রোপিত মঙ্গলবৃক্ষ বাহিরে যতই ফলবান্ হইতে থাকে তাঁহাদের নাম ভিতরে ততই বদ্ধমূল হইতে থাকে। এরূপ মহাত্মাগণের স্মরণার্থে সভা আহ্বান করা এক প্রকার বাহুল্য মনে হয়;—স্বদেশ যাঁহাদিগের নিকট এত ঋণ-পাশে বদ্ধ যে ভুলিব মনে করিলেও তাঁহাদিগকে ভুলিতে পারে না, তাঁহাদের স্মরণের জন্য সভা আহ্বানের আয়াস পাইবার প্রয়োজন কি? বাল্মীকি মুনির স্মরণার্থে কে কবে সভা আহ্বান করিয়া থাকে—তাঁহার রামায়ণে তিনি কি জাগ্রত জীবন্ত ভাবে বিরাজ করিতেছেন না? দেশের চর্ম্মচক্ষু হইতেই তিনি অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন, কিন্তু তাহা বলিয়া দেশের মনশ্চক্ষু হইতে তিনি কি অন্তর্দ্ধান হইতে পারিয়াছেন না কোন কালে পারিবেন? রামমোহন রায় যে বীজ বপন করিয়াছিলেন তাহা যদি নিস্ফল হইত, তবে সে এক স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু যখন ইহারি মধ্যে তাহা হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া শাখা প্রশাখা বিস্তীর্ণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতেও কি তিনি প্রত্যক্ষ হইতেছেন না—চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে স্মরণ করিতে হইবে? রামায়ণ যখন যুবা পুরুষের ন্যায় নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে বিচরণ করিতেছে তখন বাল্মীকির স্মরণার্থে আর কে কি করিবেন—করিবার আর আছে কি? ব্রাহ্মসমাজ যখন নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা এবং ব্রহ্ম লোকের আত্মার অন্তরতম প্রদেশ শীতল করিতেছে, তখন আবার কেন রামমোহন রায়ের স্মরণার্থে আয়াস পাওয়া! ইহাত আশ্চর্য্য নয় যে এত দিন আমরা তাঁহার স্মরণার্থে কিছু করি নাই, ইহাই আশ্চর্য্য যে, তাঁহার কার্য্যে তাঁহাকে প্রত্যক্ষবৎ অবলোকন না করিয়া তাঁহাকে স্মরণ করিবার জন্য উপায়ান্তর অবলম্বন করিতেছি—জীবন্ত ব্যাপারকে মৃত করিয়া গড়িয়া তুলিতেছি। কিন্তু আর এক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে ইহা আশ্চর্য্য নহে; যাহার নিকট উপকার-ঋণে বদ্ধ তাঁহাকে স্মরণ করিতে এবং তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে মনুষ্যের মন স্বভাবতঃ ধাবিত হয়। কিন্তু আমরা শুদ্ধ কেবল রামমোহন রায়কে স্মরণ করিতে এখানে

আসি নাই; তাঁহার বিরচিত ব্রহ্মসঙ্গীতে আমরা তাঁহার মনের কথা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষবৎ শুনিব এবং ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে ঈশ্বরবন্দনা করিয়া সেই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভবনে তাঁহাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষবৎ দেখিয়া ধন্য হইব বিশেষতঃ এই অভিপ্রায়ে আমরা সকলে অদ্য এখানে আনন্দে সম্মিলিত হইয়াছি।

রামমোহন রায় এমনি লোক ছিলেন যে যাঁহারা তাঁহাকে চক্ষে দেখিয়াছেন এবং দুই এক দিবস তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন, তাঁহার নাম উচ্চারণ মাত্রে তাঁহাদের চক্ষু অশ্রুজলে প্লাবিত হয়, আর যাঁহারা তাঁহাকে দেখেন নাই তাঁহার নাম উচ্চারণ মাত্রে তিনি তাঁহাদের মনশ্চক্ষুতে আবির্ভূত হন। এরূপ যে হয়—সে কি তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি বা ক্ষমতার প্রভাবে হয়?—তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতার প্রভাব ইংলণ্ডের মহাসভায়,তথাকার নীতি-শাস্ত্রবিৎ বিদ্বজ্জনের মধ্যে, নবদ্বীপের শাস্ত্র-বিশারদ মহামহা পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে যতদূর কার্য্য করিবার তাহা করিয়া—বঙ্গভূমিতে জয়স্তম্ভ নিখাত করিয়া—অন্তর্ধান করিয়াছে; তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতার প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করিবে যে—সে ব্যক্তি কোথায়? আর একজন তিনি জন্ম গ্রহণ করিলে সে-ই তাহাতে সমর্থ হয়! বিদ্যা বুদ্ধি ও ক্ষমতার প্রভাবে নহে কিন্তু স্বদেশের প্রতি তাঁহার হৃদয়ের যে একটি আন্তরিক ভালবাসা ছিল—যে ভালবাসা শুধু মুখের ভালবাসা নহে কিন্তু কাজের ভালবাসা—যাহার জন্য সূর্য্য চন্দ্র তারকার সমুজ্জ্বল মুখের নিকট হইতে জন্মের মতন বিদায় গ্রহণ করিয়া সূর্য্য-চন্দ্র-তারকা-পরিত্যক্ত নীহারাচ্ছন্ন সপ্তসিন্ধুপারে আপনার অমূল্য প্রাণকে বিসর্জ্জন দিলেন—আহা সে সময় একটিবার স্বদেশের মুখদর্শন করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ—রামমোহন রায়ের প্রাণ—জননীর ক্রোড়-বিরহিত শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করিয়াছিল ইহা ভাবিতে গেলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়—সেই তাঁহার উদার অকৃত্রিম ভালবাসার গুণেই আমাদের দেশের হৃদয়াভ্যন্তরে তিনি চির-স্থায়ী সত্ত্ব কিনিয়া রাখিয়াছেন। স্বদেশের মঙ্গল সাধন সকলেই করিতেছেন, রামমোহন রায়ের মঙ্গল-সাধন প্রণালী স্বতন্ত্র। তাঁহার উদার প্রশস্ত হৃদয় একবারে সকল মঙ্গলের মূলে পৌঁছিয়া সেই মূলে জল সিঞ্চন করিয়া ফল ফলাইতে প্রবৃত্ত চেষ্টা পাইয়াছিলেন; তিনি মঙ্গলের এক একটি ক্ষুদ্র শাখা লইয়া ব্যস্ত হন নাই,—শাখায় জল সিঞ্চন করিলে হইবে কি, বৃক্ষে যদি জল সিঞ্চন করিতে হয় তবে মূলেই জলসিঞ্চন কর যে ফলের উৎপত্তি হইবে। কতশত প্রখরবুদ্ধি এই সহজ সত্যটি বুঝিতে না পারিয়া জল সিঞ্চন করিয়াই সারা হন, অথচ ফল কিছুই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না; হাত বাড়াইলেই ফল পাইবেন মনে করিয়া তাঁহারা শাখায় বসিয়া শাখাতেই জল সিঞ্চন করেন, ফল হইতে দূরে পড়িবার ভয়ে মূলে নাবিতে চাহেন না। রামমোহন রায়ের বুদ্ধি যদিও দূর দূর স্থিত বিদেশ পর্য্যন্ত, বুদ্ধির আদর্শস্থল বলিয়া গ্রহীত হয় তথাপি তাঁহার বুদ্ধি ওরূপ শাখা-সক্ত ছিল না—নিখিল শাস্ত্র সমূহের মূলে সে বুদ্ধি কার্য্য করিয়াছিল—তাই আজিও আমরা তাহার ফল উপার্জ্জন করিতেছি। আমাদের দেশের সেই পবিত্র নির্ম্মল বিশুদ্ধ জ্ঞানের উৎস যে উপনিষদ শাস্ত্র তাহা সরস্বতী নদীর ন্যায় প্রায় অন্তর্হিত হইবার যো হইয়াছিল, তিনি তাহাকে বহু যত্নে উদ্ধার করিলেন—ইহাতে তাঁহার বুদ্ধিমত্তা কেবল নহে—স্বদেশের প্রতি কি যে আন্তরিক তাঁহার ভালবাসা ছিল তাহা দেদীপ্যমান প্রকাশ পাইতেছে; শর্করা বালুকামিশ্রিত হইলে পিপীলিকাই তাহা চিনিয়া লইতে পারে—অন্য কোন জীব তাহা পারে না, কেন না পিপীলিকাই তাহার আস্বাদ জানে, রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে অনেক মহামহা পণ্ডিত জন্মিয়াছেন তাঁহারা স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র মন্ত্র প্রভৃতি লইয়াই কাল যাপন করিতেন—তাঁহারা উপনিষদাদি বেদান্ত শাস্ত্র আছে বলিয়া জানিতেন কি না তাহাই সন্দেহ, যদি বা জানিতেন সে জানা না জানারই তুল্য, কেন না তাহার আস্বাদ তাঁহারা জানিতেন না। রামমোহন রায় আপনার প্রশস্ত হৃদয়ের জ্যোতিতে সেই সকল প্রচ্ছন্ন শাস্ত্রের প্রকৃত মর্য্যাদা অবগত হইয়া সেই মূল প্রদেশে আপনার সমুদয় যত্ন সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাই আজিকার দিনে ব্রাহ্মধর্ম্ম লইয়া এই তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। উপনিষদাদি শাস্ত্র সকল আমরা বিস্মৃত ছিলাম, তাহাদিগকে আমাদের স্মৃতিপথে আনিবার জন্য

যিনি আপনার জীবনের সারাংশ ক্ষেপণ করিলেন, তাঁহাকে স্মৃতি-পথে আনিবার জন্য আমাদের কোন আয়াস পাইতে হইতেছে না—এই সমস্ত বিস্তীর্ণ বঙ্গভূমির মধ্যে একজনও এমন পাওয়া যাইবে না যে তাঁহার নামোচ্চারণে আপনাকে এবং আপনার দেশকে গৌরবান্বিত মনে না করে—অতএব সর্ব্ববাদী-সম্মত অদ্যকার এই কার্য্যে আনন্দের সহিত আসুন আমরা প্রবৃত্ত হই—তাঁহার জীবনবৃত্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহার রচিত গীত সমস্তে তাঁহার মনের কথা অবগত হইয়া এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমাজ-মন্দিরে ঈশ্বর-বন্দনা করিয়া—অদ্যকার দিনের সার্থক্য সম্পাদন করি।

অদূরে উন্নত ভূমির উপর গায়কেরা বসিয়া ছিলেন। তাঁহারা মধুর ও উচ্চস্বরে গম্ভীর মহোচ্চ ভাব-পূর্ণ তানলয়বিশুদ্ধ এই ব্রহ্মসঙ্গীতটি গাইতে লাগিলেন।

রাগিণী ইমনকল্যাণ—তাল ধামাল।

শাশ্বতমভয়মশোকমদেহং।
পূর্ণমনাদি চরাচরগেহং।
চিন্তয় শান্তমতে পরমেশং।
স্বীকুরু তত্ত্ববিদামুপদেশং।
দিনকরশিশিরকরাবতিযাতঃ।
যস্য ভয়াদিহ ধাবতি বাতঃ।
ভবতি যতোজগতোস্য বিকাশঃ।
স্থিতিরপি পুনরিহ তস্য বিনাশঃ।
যদনুভবাদপগচ্ছতি মোহঃ।
ভবতি পুনর্ন শুচামধিরোহঃ।
যোন ভবতি বিষয়ঃ করণানাং।
জগতি পরং শরণং শরণানাং।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর দেব মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রিয় সহচর ও বন্ধু। তাঁহারই প্রস্তাবে রামমোহন রায় প্রথমে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করেন। তিনি অসুস্থতা ও অক্ষমতা নিবন্ধন সভাস্থলে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য অনেকেই উৎসুক ছিলেন কিন্তু দুরদৃষ্ট ক্রমে এই বিষয়ে তাঁহাদিগের আশা পূর্ণ হয় নাই। চন্দ্রশেখর বাবু আহ্বান পত্র পাইয়া যেরূপ হর্ষ প্রকাশ করেন এবং অনুপস্থানের জন্য দুঃখিত হইয়া যেরূপ লিখিয়া ছিলেন শ্রদ্ধাস্পদ বাবু রাজনারায়ণ বসু সেই দুই খানি পত্র পাঠ করিলেন।

BURDWAN, 26th Dec. 1878.

My dear Rajnarayan Babu.

In reply to your kind letter of the 24th, I beg to assure you, that I shall be most happy indeed, to deem it an honour to be allowed, to join the meeting on the 9th January next, in honour of the memory of Rajah Rammohun Roy, at the house of our revered Pradhan Acharjya.

I must however tell you beforehand that it shall be impossible for me in the present state of my health to take any very active part in your proceedings on the occasion.

Trusting you have been well,

I remain yours truly,
C. S. DEB.

BURDWAN, 18th January 1879.
Sunrise.

My dear Rajnarain Babu.

Having had an attack of asthma since the night before last, I am afraid it shall be impossible for me to attend the meeting at Babu Devendra Nath Thakur's tomorrow afternoon. You must therefore excuse me if I fail to go down in time.

I remain yours very truly.
C. S. DEB.

অনন্তর বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উত্থিত হইলেন। এই উৎসাহশীল যুবক ব্রাহ্মসমাজের এক জন সুপরিচিত বন্ধু। ইহাঁর সমস্ত বিদ্যা বুদ্ধি ও জীবন ব্রাহ্মসমাজের পরিচর্য্যায় নিয়োজিত। ইনি এক জন প্রসিদ্ধ সদ্বক্তা। তেজস্বী অগ্নিময় বাক্যে চিত্ত উত্তেজিত করিতে এবং করুণ ও কোমল বাক্যে চিত্ত আর্দ্র করিতে ইহাঁর ন্যায় অতি অল্প লোকই পারেন। ইহাঁর উদ্দীপনায় শ্রোতৃ-

গণ আত্ম-বিস্মৃত হইয়া ভাবের প্রখর স্রোতে নীয়মান হয়। তৎকালে কাহারই আর স্বাধীন চিন্তার অবসর থাকে না। বক্তার ভাষা সাধারণের বোধ-সুলভ ও ওজস্বী; ফলতঃ আমরা ইহাঁর বক্তৃতা-শক্তি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রশংসা করি। কিন্তু আমরা দুঃখের সহিত পাঠকগণকে জানাইতেছি যে আমরা স্থানাভাবে তাঁহার বক্তৃতার কঙ্কালমাত্র সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

নগেন্দ্র বাবু কহিলেন, আজ কি সৌভাগ্যের দিন। যে গৃহে রাজা রামমোহন রায় নিয়ত গমনাগমন করিতেন, যেস্থানে বসিয়া তিনি জনসমাজের হিতকর নানা বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেন, যে গৃহের সুকুমার শিশুদিগকে তিনি ক্রোড়ে লইতেন আজ সেই গৃহে তাঁহারই প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য আমরা সমাগত হইয়াছি। নগেন্দ্র বাবু এইরূপে মুখবন্ধ করিয়া বক্তব্য বিষয়গুলি ক্রমশঃ বিবৃত করিতে লাগিলেন।

নগেন্দ্র বাবু বলিলেন, রামমোহন রায় যখন অল্পবয়স্ক ছিলেন তখন তাঁহার ধর্ম্মজিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়। সেই বয়সে এই জ্ঞানেচ্ছা চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি তির্ব্বত দেশে যাত্রা করেন। তখন বঙ্গদেশের অবস্থা অতি ভয়ানক, এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাওয়া বড় কঠিন ব্যাপার, পথে দস্যুতস্করের অত্যন্ত উপদ্রব, কিন্তু রামমোহন রায় সেই সময় সেই অল্প বয়সে সেই দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া তিব্বতে উপনীত হন এবং তথায় লামাধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

নগেন্দ্র বাবু বলিলেন রামমোহন রায়ের ধর্ম্মজিজ্ঞাসা এতদ্দেশের বিস্তর উপকার সাধন করিয়াছে। এতদ্দেশে বেদ বেদান্তের কিছুমাত্র সমাদর ছিল না। চতুষ্পাঠীতে কেবল ব্যাকরণ স্মৃতি ও ন্যায় শাস্ত্র পঠিত হইত। হিন্দু-জাতির প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ বেদান্তের চর্চ্চার নাম গন্ধও ছিল না। রামমোহন রায় গ্রন্থপ্রকাশ, বিচার ও প্রমাণোদ্ধার করিয়া ঐ সকল প্রাচীন গ্রন্থে সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন।

উপধর্ম্মে রামমোহন রায়ের বিদ্বেষ-বুদ্ধি ছিল। তিনি এই উপধর্ম্ম উন্মূলন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন এবং সেই অজ্ঞানতার ঘোর অন্ধকার মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করেন। যে জাতির যে কোন ব্যক্তি সর্ব্বজাতির পিতা মাতা নিরাকার অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের উপাসনা করিতে অভিলাষ করেন ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার উপাসনা-স্থান। ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনে রামমোহন রায়ের যে এই অভিপ্রায় ছিল ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টডীড্ তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। যে কোন জাতি যে কোন বর্ণ ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারিবেন ট্রষ্টডীডের ইহাই তাৎপর্য্য। রামমোহন রায় এই রূপে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মধর্ম্মকে উদ্ধার করিলেন বটে কিন্তু এতদ্দেশের উপযোগি করিবার জন্য তাহাতে হিন্দু-ভাব অর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মসমাজে উপনিষদাদি হিন্দুশাস্ত্র আচার্য্য কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইতে লাগিল এবং হিন্দুহৃদয়ের প্রিয় বৈরাগ্য বিষয়ক সঙ্গীত গীত হইতে লাগিল।

নগেন্দ্র বাবু রামমোহন রায়ের সম্পাদিত ধর্ম্মসংস্কার কার্য্য বর্ণনা করিয়া তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত সমাজসংস্কার কার্য্য বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; এ বিষয়ে তাঁহার সকল কার্য্য মধ্যে এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকের দুরবস্থা মোচনের চেষ্টাকে তিনি সর্ব্বোপরি প্রাধান্য প্রদান করিলেন।

নগেন্দ্র বাবু বলিলেন রামমোহন রায়ের হৃদয় এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের দুঃখে অতিমাত্র কাতর ছিল। চিরপ্রণয়িনী চির-

সহচরী প্রাণ দিয়াও পতিভক্তি অব্যাহত রাখিবে এই ধর্ম্ম্য ব্যবহার অবশ্যই শ্লাঘনীয় কিন্তু স্নেহের পুত্তলী পুত্র কন্যাকে সজল নয়নে জন্মের মত চুম্বন করিয়া বিদায় গ্রহণ, লাজাঞ্জলি নিক্ষেপ পূর্ব্বক সপ্তবার চিতা প্রদক্ষিণ, চিতাশয্যায় পতির মৃত দেহোপরি শয়ন, ঘৃতধারার সহিত প্রক্ষিপ্ত শালনির্য্যাসে চিতানল সতেজে উদ্দীপন, শ্মশানভৈরব হরি-ধ্বনির সহিত তুমুল বাদ্যধ্বনি, একটি জীবন্ত মানব শরীর একদণ্ড মধ্যে ভস্মীকরণ এই সমস্ত ভীষণ লোমহর্ষণ দৃশ্য মহাত্মা রামমোহন রায়ের অতিমাত্র অসহনীয় হইয়া উঠে। তিনি প্রথমে এই কুপ্রথা উন্মূলন করিবার নিমিত্ত সকলের দ্বারে দ্বারে পর্য্যটন করিয়াছিলেন, তিনি ইহার জন্য নানারূপ বিদ্রূপ ও কটূক্তি সহ্য করিয়াছিলেন কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের জন্য তাঁহার হিতৈষণার দুর্দমনীয় আবেগ কিছুতেই নির্বাণ হয় নাই। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে তাঁহার দয়ার্দ্র চিত্ত যে ভাবে গ্রহণ করিত তাঁহার নিজের বাক্যই তাহা সপ্রমাণ করিবে। সহমরণের পক্ষীয় লোকেরা বলিয়াছিলেন যে স্ত্রীলোকদিগের স্বভাব অতি মন্দ অতএব তাহাদের মৃত্যুই শ্রেয়, রামমোহন রায় তাহার প্রত্যুত্তরে বলিতেছেন—

পঞ্চম, তাহাদের ধর্ম্মভয় অল্প। এ অতি অধর্ম্মের কথা; দেখ কিপর্য্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্ম্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে। অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ, যাঁহারা দশ পোনের বিবাহ অর্থের নিমিত্তে করেন, তাহারদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারো সহিত দুই চারি বার সাক্ষাৎ করেন, অথাপিও ঐ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকেই ধর্ম্মভয়ে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ব্যতিরেকে এবং স্বামী দ্বারা কোন উপকার বিনাও পিতৃগৃহে অথবা ভ্রাতৃগৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা দুঃখ ও ক্লেশ সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন; আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্য বর্ণের মধ্যে যাঁহারা আপন আপন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করেন, তাঁহারদের বাটীতে প্রায় স্ত্রীলোক কি কি দুর্গতি না পায়? বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্দ্ধ অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন; যেহেতু স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাসীবৃত্তি করে, অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীতকালে, কি বর্ষাতে স্থানমার্জ্জন, ভোজনাদি পাত্র মার্জ্জন, গৃহলেপনাদি তাবৎ কর্ম্ম করিয়াথাকে, এবং সুপকারের কর্ম্ম বিনাবেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে, অর্থাৎ স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ী ও স্বামীর ভ্রাতৃবর্গ, আমাত্যবর্গ এসকলের রন্ধন পরিবেশনাদি আপন আপন নিয়মিত কালে করে, যেহেতু হিন্দুবর্গের অন্য জাতি অপেক্ষা ভাই সকল ও আমাত্য সকল একত্র স্থিতি অধিক কাল করেন, এই নিমিত্ত বিষয়ঘটিত ভ্রাতৃবিরোধ ইহাঁদের মধ্যে অধিক হইয়া থাকে; ঐ রন্ধনে ও পরিবেশনে যদি কোনো অংশে ত্রুটি হয়, তবে তাহারদিগের স্বামী, শাশুড়ী, দেবর প্রভৃতি কি কি তিরস্কার না করেন, এ সকলকেও স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে, আর সকলের ভোজনাবশেষে ব্যঞ্জনাদি উদরপূরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা সন্তোষ পূর্ব্বক আহার করিয়া কালযাপন করে। আর অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ, যাঁহারদের ধনবত্তা নাই, তাঁহারদের স্ত্রীলোক সকল গোসেবাদি কর্ম্ম করেন, এবং পাকাদির নিমিত্ত গোময়ের ঘসী স্বহস্তে দেন, বৈকালে পুষ্করিণী অথবা নদী হইতে জলাহরণ করেন, রাত্রিতে শয্যাদি যাহা ভৃত্যের কর্ম্ম, তাহাও করেন, মধ্যে মধ্যে কোনো কর্ম্মে কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলে তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যদ্যপি কদাচিৎ ঐ স্বামীর ধনবত্তা হইল তবে ঐ স্ত্রীর সর্ব্বপ্রকার জ্ঞাতসারে এবং দৃষ্টিগোচরে প্রায় ব্যভিচার-দোষে মগ্ন হয়, এবং মাস মধ্যে একদিবসও তাহার সহিত আলাপ নাই। স্বামী দরিদ্র যে পর্য্যন্ত থাকেন, তাবৎ নানাপ্রকার কায়ক্লেশ পায়, আর দৈবাৎ ধনবান্ হইলে মানস দুঃখে কাতর হয়, এ সকল দুঃখ ও মনস্তাপ কেবল ধর্ম্মভয়েই তাহারা সহিষ্ণুতা

করে, আর যাহার স্বামী দুই তিন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করে, তাহারা দিবারাত্রি মনস্তাপ ও কলহের ভাজন হয়, অথচ অনেকে ধর্ম্মভয়ে এ সকল সহ্য করে; কখন এমত উপস্থিত হয় যে, এক স্ত্রীর পক্ষ হইয়া অন্য স্ত্রীকে সর্ব্বদা তাড়ন করে, এবং নীচ লোক ও বিশিষ্ট লোকের মধ্যে যাহারা সৎসঙ্গ না পায়, তাহারা আপন স্ত্রীর কিঞ্চিৎ ত্রুটি পাইলে অথবা নিষ্কারণ কোন সন্দেহ তাহারদিগের প্রতি হইলে চোরের তাড়না তাহারদিগকে করে, অনেকেই ধর্ম্মভয়ে লোকভয়ে ক্ষমাপন্ন থাকে, যদ্যপিও কেহ তাদৃশ যন্ত্রণার অসহিষ্ণু হইয়া পতির সহিত ভিন্নরূপে থাকিবার নিমিত্ত গৃহত্যাগ করে, তবে রাজদ্বারে পুরুষের প্রাবল্য নিমিত্ত পুনরায় প্রায় তাহাদিগকে সেই পতিহস্তে আসিতে হয়। পতিও সেই পূর্ব্বজাত ক্রোধের নিমিত্ত নানা ছলে অত্যন্ত ক্লেশ দেয়, কখন বা ছলে প্রাণবধ করে; এসকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং অপলাপ করিতে পারিবেন না। দুঃখ এই যে, এই পর্য্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধনপূর্ব্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।

রামমোহন রায় সহগমন প্রথা উন্মূলিত করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন না, যাহাতে বিধবার পুনঃসংস্কার হয় তদ্বিষয়েও তিনি যত্নবান হন। হিন্দুপরিবারে বিধবার অত্যন্ত দুরবস্থা, যেন তাহারই কর্ম্মবিপাক তাহার এই দুর্ঘটনার কারণ এই হেতুবাদে সে সকলের বিদ্বিষ্ট হইয়া থাকে, সাংসারিক কোন মাঙ্গলিক কার্য্যে তাহার হস্ত নাই, সে আমরণ সমস্ত ভোগসুখে বঞ্চিত হইয়া কেবল কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিবে। এই তরঙ্গময় সংসারে নানা জ্বালা ও যন্ত্রণা কিন্তু তাহার জুড়াইবার স্থান নাই। আত্মীয় স্বজন তাহাকে পুনঃ পুনঃ নির্য্যাতন করিতেছে কিন্তু তাহাকে সান্ত্বনা করিবার কেহ নাই, তাহার সর্ব্বতোমুখী প্রবৃত্তি আছে কিন্তু সকলেরই দ্বার অবরুদ্ধ। হিন্দু বিধবার এই সমস্ত কষ্ট ক্লেশ রামমোহন রায়ের প্রশস্ত ও কোমল হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত দিয়াছিল। হিন্দুসমাজের তদানীন্তন বদ্ধমূল কুসংস্কার নিবন্ধন তিনি বিধবার পুনঃসংস্কার প্রদানে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই বটে কিন্তু তিনি এই বিষয় লইয়া যে একটী আন্দোলন করিয়াছিলেন তাহার আর সন্দেহ নাই। তাঁহার কোন প্রদৌহিত্র বলেন, রামমোহন রায়ের বৈষয়িক কাগজ পত্রের ভিতর এই বিধবাবিবাহ বিষয়ক আন্দোলনের কোন নিদর্শন-পত্র তিনি দেখিয়াছেন। রামমোহন রায় যখন বিলাতে গমন করেন তখন এই জনরব উঠিয়াছিল যে তিনি বিধবাবিবাহের জন্য একটি আইন বিধিবদ্ধ করাইবার নিমিত্ত বিলাত গমন করিলেন।

নগেন্দ্র বাবু বলিলেন, রামমোহন রায় জাতিভেদের বিপক্ষেও উত্থিত হইয়াছিলেন। তিনি জাতিভেদ-প্রথার বিপক্ষে বুদ্ধঘোষ নামক বৌদ্ধের প্রণীত বজ্রসূচি নামক গ্রন্থ বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। যখন চতুর্দ্দিকে ঘোরতর কুসংস্কার, জনসমাজ সত্যানুসন্ধান ও সত্য গ্রহণ করিতে একান্ত পরাঙ্মুখ সেই সময় রামমোহন রায় সমস্ত উন্নতির অন্তরায় স্বরূপ জাতিভেদের উপর কঠোর কুঠারাঘাত করেন এবং বিশুদ্ধ ধর্ম্ম্য ব্যবহার ও ভ্রাতৃভাব প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা পান।

নগেন্দ্র বাবু রামমোহন রায়ের সমাজসংস্কার কার্য্য বর্ণন করিয়া তাঁহা দ্বারা ভারতের সকল মঙ্গলের নিদানভূত উৎকৃষ্ট সাধারণ শিক্ষাপ্রণালীর অনুমোদন ও সমর্থনের বিষয় বলিলেন।

রামমোহন রায়ের বুদ্ধি কর্ম্মঠ ছিল, সুতরাং যে শিক্ষার বলে মনুষ্য সামাজিক হয়, ও জড় প্রকৃতির উপর আধিপত্য করিতে সক্ষম হয়, যে শিক্ষার বলে মনুষ্যের বুদ্ধি বদ্ধভাব পরিহার পূর্ব্বক মুক্ত বায়ুতে

বিহার করিতে পারে, যে শিক্ষা পৃথিবী কর্ম্ম-ক্ষেত্র এবং মনুষ্য সেই ক্ষেত্রের শ্রমজীবি কৃষক এই রূপ ভাব মনোমধ্যে আনিয়া দেয়, যে শিক্ষা মনুষ্যের অস্থিতে তেজ ও বল ও স্বাধীনতার সঞ্চার করিয়া দেয় রামমোহন রায় সেই ইংরাজী শিক্ষার অনুমোদন করিতেন। তিনি সংস্কৃত শিক্ষার বহুতর দোষ উদ্‌ঘাটন এবং ইংরাজী শিক্ষার অনুমোদন করিয়া লর্ড আমহরষ্টকে যে পত্র লিখেন তদ্দারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। এই পত্র দ্বারা আরো প্রমাণিত হইতেছে যে যদিও রামমোহন রায় ঈশ্বরের নিরাকারত্ব প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত অন্যান্য শাস্ত্রের মধ্যে বেদান্তদর্শনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ছিলেন তথাপি ঐ দর্শনে তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস ছিল না। তিনি এই পত্রে বলিয়াছেন বেদান্তদর্শন লোককে নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন করিয়া দেয়। বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব নাই, এ সমস্তই ভ্রম মাত্র, এই ভাব অন্তরে একবার বদ্ধমূল হইলে পার্থিব উন্নতিকল্পে আর কাহারই প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না। বেদান্তদর্শন বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব লোপের সহিত প্রীতি স্নেহ প্রভৃতি লোকের আন্তরিক কোমল ভাবগুলিও বিলুপ্ত করিয়া দেয়। কে কাহার বন্ধু, কে কাহার পিতা, কে কাহার পুত্র, কিছুই কিছু নয়, এই সর্ব্বসংহারক ঔদাস্য মনুষ্যকে বিভ্রান্ত করিয়া সংসারে আস্থাশূন্য করিয়া ফেলে। এই পত্র দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে রামমোহন রায় বৈদান্তিক ছিলেন না, তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন।

"TO HIS EXCELLENCY THE RIGHT HONORABLE
LORD AMHERST, GOVERNOR GENERAL IN COUNCIL

MY LORD.

Humbly reluctant as the natives of India are to obtrude upon the notice of Government the sentiments they entertain on any public measure, there are circumstances when silence would be carrying this respectful feeling to culpable excess. The present rulers of India, coming from a distance of many thousand miles to govern a people whose language, literature, manners, customs, and ideas, are almost entirely new and strange to them, cannot easily become so intimately acquainted with their real circumstances as the natives of the country are themselves. We should therefore be guilty of a gross dereliction of duty to ourselves and afford our rulers just grounds of complaint at our apathy, did we omit on occasions of importance like the present, to supply them with such accurate information as might enable them to devise and adopt measures calculated to be beneficial to the country, and thus second by our local knowledge and experience their declared benevolent intentions for its improvement.

"The establishment of a new Sanscrit School in Calcutta evinces the laudable desire of Government to improve the natives of India by education,—a blessing for which they must ever be grateful, and every well-wisher of the human race must be desirous that the efforts, made to promote it, should be guided by the most enlightened principles so that the stream of intelligence may flow in the most useful channels.

"When this seminary of learning was proposed, we understood that the Government in England had ordered a considerable sum of money to be annually devoted to the instruction of its Indian subjects. We were filled with sanguine hopes that this sum would be laid out in employing European gentlemen of talents and education to instruct the natives of India in Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy, and other useful sciences which the natives of Europe have carried to a degree of perfection that has raised them above the inhabitants of other parts of the world.

"While we looked forward with pleasing hope to the dawn of knowledge, thus promised to the rising generation, our hearts were filled with mingled feelings of delight and gratitude, we already offered up thanks to Providence for inspiring the most generous and enlightened nations of the West with the glorious

ambition of planting in Asia the arts and sciences of Modern Europe.

"We find that the Government are establishing a Sanskrit school under Hindu Pundits to impart such knowledge as is already current in India. This seminary (similar in character to those which existed in Europe before the time of Lord Bacon, can only be expected to load the minds of youth with grammatical niceties and metaphysical distinctions of little or no practical use to the possessors or to society. The pupils will there acquire what was known two thousand years ago with the addition of vain and empty subtleties since then produced by speculative men such as is already commonly taught in all parts of India.

"The Sanscrit language so difficult that almost a life time is necessary for its acquisition is well known to have been for ages a lamentable check to the diffusion of knowledge, and the learning concealed under this almost impervious veil, is far from sufficient to reward the labour of acquiring it. But if it were thought necessary to perpetuate this language for the sake of the portion of valuable information it contains, this might be much more easily accomplished, by other means than the establishment of a new Sanscrit College, for there have been always and are now numerous professors of Sanscrit in the different parts of the country engaged in teaching this language as well as the other branches of literature which are to be the object of the new seminary. Therefore their more diligent cultivation, if desirable, would be effectually proomoted, by holding out premiums and granting certain allowances to their most eminent professors, who have already undertaken on their own account to teach them, and would by such rewards be stimulated to still greater exertion.

From these considerations, as the sum set apart for the instruction of the natives of India was intended by the Government in England for the improvement of its Indian subjects, I beg leave to state, with due deference to your Lordship's exalted situation, that if the plan now adopted be followed, it will completely defeat the object proposed' since no improvement can be expected from inducing youg men to consume a dozen of years of the most valuable period of their lives in acquiring the niceties of Baikarana or Sanskrit Grammar. For instance, in learning to discuss such points as the following; *kha'da*, signifying to eat, *kha'dati* he or she or it eats; query, whether does *kha'dati* taken as a whole conveys the meaning he, she or it eats, or are separate parts of this meaning conveyed by distinctions of the word. As if in the English language it were asked how much meaning is there in the *eat* and how much in the *s?* And is the whole meaning of the word conveyed by these two portions of it distinctly or by them taken jointly?

Neither can much improvement arise from such speculations as the following which are the themes suggested by the Vedanta;—in what manner is the the soul absorbed in the Deity? What relation does it bear to the Divine Essence? Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe, that all visible things have no real existence. that as father, brother, &c. have no actual entity they consequently deserve no real affection, and therefore the sooner we escape from them and leave the world the better. Again, no essential benefit can be derived by the student of the *Mimansa* from knowing what it is that makes the killer of a goat sinless by pronouncing certain passages of the Vedanta and what is the real nature and operative influence of passages of the Vedas, &c.

The student of the Naya Shastra cannot be said to have improved his mind after he has learned from it into how many ideal classes the objects in the universe are divided and what speculative relation, the soul bears to the body, the body to the soul, the eye to the ear, &c.

In order to enable your Lordship to appreciate the utility of encouraging such imaginary learning as above characteriesd, I beg your Lordship will be pleased to compare the state of science and literature in Europe before the time of Lord Bacon with the progress of knowledge made since he wrote.

If it had been intended to keep the British nation in ignorance of real knowledge, the Baconian philosophy would not have been allowed to displace the system of the schoolmen which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner the

Sanscrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness if such had been the policy of the British legislature. But as the improvement of the native population is the object of the Government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry. Anatomy, with other useful sciences, which may be accomplished with the sums proposed by employing a few gentlemen of talents and learning educated in Europe and providing a College furnished with necessary books, instruments, and other apparatus.

In representing this subject to your Lordship I conceive myself discharging a solemn duty which I owe to my countrymen and also to that enlightened sovereign and legislature which have extended their benevolent care to this distant land, actuated by a desire to improve the inhabitants, and therefore humbly trust you will excuse the liberty I have taken in thus expressing my sentiments to your Lordship.

I have the honor &c,
RAM MOHUN ROY."

নগেন্দ্র বাবু এতদ্দেশীয়দিগের সুশিক্ষা সাধন বিষয়ে রামমোহন রায়ের যত্ন ও চেষ্টার উল্লেখ করিয়া তিনি বঙ্গভাষার যে রূপ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন তাহা বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রামমোহন রায়ের সময় বঙ্গভাষার অবস্থা অতিমন্দ ছিল। তৎকালে আদালতের পারস্য-মিশ্রিত বাঙ্গলাই সর্ব্বত্র ব্যবহার হইত। কিন্তু তাহা এত কদর্য্য যে তদ্দ্বারা মনের বিশেষ বিশেষ ভাব ব্যক্ত হইতে পারিত না। রামমোহন রায় এই বঙ্গভাষার সংস্কার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। তিনি গদ্য লিখিবার সূত্রপাত করেন। তাঁহার পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় কোন রূপ ব্যাকরণ ছিল না তিনি তাহা প্রস্তুত করেন। রামমোহন রায় কেবল ভাষাসংস্কার করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, যে সমস্ত ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিলে লোকের বুদ্ধিবৃত্তি তীক্ষ্ণ ও কর্ম্মক্ষম হয় তিনি সেই সকল গ্রন্থ বাঙ্গলায় অনুবাদ করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার অনুবাদিত খগোল ও জ্যাগ্রাফি (Geography) এক সময় বঙ্গদেশের বিলক্ষণ উপকার সাধন করিয়াছিল।

নগেন্দ্র বাবু ভাষা-সংস্কারের বিষয় এই রূপ উল্লেখ করিয়া রামমোহন রায় এতদ্দেশের কিরূপ রাজনৈতিক উপকার সাধন করিয়াছিলেন তাহা বর্ণন করিতে লাগিলেন। নগেন্দ্র বাবু কহিলেন রাজ্যমধ্যে সাধারণ মত পরিজ্ঞানের উপায় মুদ্রাযন্ত্র। প্রজারা রাজ-পুরুষদিগের ব্যবহার বিষয়ে মুক্তকণ্ঠ হইয়া গবর্ণমেণ্ট সমীপে আপনাদিগের মনোবেদনা জ্ঞাপন করিবে সার চার্লস মেট্‌কাফের এই অভিপ্রায়। তিনি তদনুসারে মুদ্রাযন্ত্রকে স্বাধীন করিয়া দেন। রামমোহন রায় এই দেশহিতকর কার্য্যে অতিমাত্র প্রীত হইয়া মেট্‌কাফকে অভিনন্দন করেন। তাঁহার হৃদয় অসহায় প্রজাদিগের জন্য অত্যন্ত কাতর ছিল। যাহাতে প্রজারা জীবন ও স্বত্ব সুখ সচ্ছন্দে রক্ষা করিতে পারে তিনি তন্নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করেন, ইত্যবসরে দিল্লীর বাদসাহ তাঁহাকে বিলাতে পাঠাইয়া দেন। তিনি তথায় গিয়া অহোরাত্র কায়মনোবাক্যে ভারতের হিতচিন্তা করিতেন। ভিন্ন দেশীয় রাজার পক্ষে ভিন্ন দেশীয় প্রজাদিগের অবস্থার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সহজ নয়, সুতরাং সেই রাজা শাসনের অনুরোধে যে সকল নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করেন তাহাও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। রামমোহন রায় বিলাতে গিয়া ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনৈতিক দোষ প্রদর্শন ও রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিবার চেষ্টা করেন। তিনি পার্লেমেণ্ট মহাসভায় আহূত হন এবং এতদ্দেশীয়দিগের অবস্থা বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেন। দরিদ্র কৃষক-

দিগের উপর তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। হয় ত উহারা কিছুই জানিতে পারে নাই কিন্তু রামমোহন রায়ের হৃদয় উহাদের জন্য অশ্রুপাত করিত। তিনি পার্লমেণ্ট মহাসভায় ইহাদের পক্ষ সমর্থন করেন এবং ইহাদের অবস্থা সম্যক প্রকারে সভার হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেন।

রামমোহন রায় সামান্য সামান্য বিষয়ের সংস্কার করিতেও ক্রুটি করেন নাই। এমন সামান্য বিষয় যে পরিচ্ছদ তাহার সংস্কারের প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল। তাঁহার সময় পরিচ্ছদ বিষয়ে মুসলমানদিগের অনুকরণ চলিতে ছিল কিন্তু তিনি তাহার পরিবর্ত্ত করিয়া যান। খিড়কিদার পাগড়ীর পরিবর্ত্তে বাঁধা পাগড়ী এবং ঘাগরার পরিবর্ত্তে কাবা পরিধান করিবার নিয়ম তিনিই প্রবর্ত্তিত করেন। উক্ত কাবা এক্ষণে পাঁচকানে পরিণত হইয়াছে। এই পরিচ্ছদ-পারিপাট্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহার বিশেষ যত্ন ও আগ্রহ ছিল। এমন কি, ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করিতেও তিনি উক্ত পরিচ্ছদ পরিধান না করিয়া আসিতেন না এবং কেহ এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিলে তিনি তাঁহাকে তদ্বিষয়ে সাবধান হইতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেন।

রামমোহন রায় ভারতবর্ষের যথার্থতই হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি অতি দূরদর্শী ছিল; জনসমাজের প্রকৃত অভাব কি তিনি সেই অজ্ঞান-অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে বিলক্ষণ বুঝিয়া ছিলেন এবং সেই সময়ে এই সমস্ত অভাব মোচনের উপায় ও চেষ্টা করিয়াছিলেন। ফলতঃ আমরা যে উন্নতির সমষ্টির উপর দণ্ডায়মান আছি তিনিই ইহার সূত্রপাত করিয়া যান। যিনি ধর্ম্মসংস্কার করিতে চান রামমোহন রায় তাঁহার জন্য ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া তাহার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন, যিনি বহুল পরিমাণে পাশ্চত্ত জ্ঞান চান রামমোহন রায় তাঁহারও জন্য দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন, যিনি সমাজসংস্কার করিতে চান রামমোহন রায় তাঁহারও জন্য দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন, যিনি বঙ্গভাষা সংস্কার করিতে চান রামমোহন রায় তাঁহারও জন্য দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন, যিনি রাজনীতির উন্নতি করিতে চান রামমোহন রায় তাঁহারও জন্য দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছেন। এখন এমন কোন শ্রেয়স্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে না যাহাতে রামমোহন রায় হস্তক্ষেপ না করিয়াছেন। আমরা তাঁহারই প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিতেছি। সেই মহাত্মাই সকল কার্য্যের মূলাধার।

নগেন্দ্র বাবু এইরূপে রাজা রামমোহন রায়ের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণনের উপসংহার করিয়া কহিলেন, আমরা সেই মহাত্মার স্মরণ-চিহ্ন রক্ষা করিবার আজিও কোন অনুষ্ঠান করি নাই। এক্ষণে সকলের উচিত যে তিনি যে বঙ্গবিদ্যার অনুশীলনের জন্য যত্নশীল ছিলেন তাহাতে প্রবৃত্তি বিধানের নিমিত্ত ছাত্রবৃত্তি স্থাপন করা। আমরা যে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ তদ্দারা তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদত্ত হইতে পারিবে।

অনন্তর রামমোহন রায়ের প্রশংসা সূচক একটী গীত গীত হইল।

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল চৌতাল।

ছিল ভ্রান্ত ধর্ম্মে তমোময় ভারত ভুবন
যেমন অস্তাচলে রবি গেলে নিশির আগমন।
হেরে দেশের দুর্গতি রামমোহন মহামতি
প্রকাশিতে সত্যজ্যোতি করিলেন প্রাণপণ।
সর্ব্ব-জাতি-পিতা-মাতা পুজিবে সকল ভ্রাতা
করিতে উপায় তার ভাবিলেন মহাত্মন।
হলো ব্রাহ্ম ধর্ম্মোদয় পবিত্র অমৃতময়
খুলিল মহীমণ্ডলে আনন্দের প্রস্রবণ।
ধন্য মহাভাগ তুমি! ধন্য হে ভারতভূমি!
শুভক্ষণে প্রসবিলে পুরুষ রতন।

পরে বাবু রাজনারায়ণ বসুর প্রস্তাবে জন্মান্ধ শ্রীযুক্ত দীননাথ অধ্যেতা মহাশয় সভাস্থ সমস্ত লোককে আর্দ্র করিয়া নিম্নলিখিত গীতটি গাইতে লাগিলেন। এই গীত ও উপরোক্ত গীতটি মেদিনীপুরে রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভায় প্রতি বৎসর গীত হইত।

রাগিনী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

কোথা আছ দেখ এসে মহামতি রামমোহন।
তোমার জন্মভূমি ভারতভূমি হয়েছে কি সুশোভন।
যে বৃক্ষ রোপিলে তুমি, ছাইল সে বঙ্গভূমি, সুরভি কুসুম তার দেখা যায় অগণন—ছুটি তার পরিমল, মোহিল দেশ সকল, হস্তিনা, দ্বারকা আরো মদ্র ভূমিবাসীগণ।
ছিল তব আশা মাত্র, বুঝিবে লোক্‌ সত্যতত্ত্ব, দেখ হে কি পরিবত্ত হয়েছে এখন—(তোমায়) যারা করিত পীড়ন, তাদেরি সন্তানগণ, কৃতজ্ঞতা উপহার তোমারে করে অর্পণ।

পরে শ্রদ্ধাস্পদ বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় উত্থিত হইয়া স্বীয় স্বাভাবিক কবিত্বে স্থলবিশেষ অনুরঞ্জিত করিয়া রামমোহন রায়ের সম্পর্কে কতকগুলি গল্প বলিলেন।

রামমোহন রায়ের শিষ্য স্থবিরশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বসু মহাশয়ও ঐরূপ কতকগুলি গল্প বলিবেন কথা ছিল, কিন্তু এই অশীতিপর বৃদ্ধ বার্দ্ধক্য-জনিত ক্ষীণতা প্রযুক্ত সভায় দণ্ডায়মান হইয়া তাহা বলিতে পারেন নাই। তিনি যে সকল গল্প জানিতেন তাহা বাবু রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়া দিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বাবু তাহা আপনার গল্পের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন। তিনি যে গল্পগুলি করিলেন আমরা তাহার মধ্যে তিনটি নির্ব্বাচন করিয়া নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

(১)

আপনারা অবগত আছেন সহমরণ প্রথা নিবারণ কার্য্যে তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরল লর্ড উইলিয়ম বেন্‌টিঙ্কের নিকট হইতে রামমোহন রায় প্রবল সহযোগিতা প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। লর্ড উইলিয়ম বেন্‌টিঙ্ক গবর্ণর জেনেরল, ও রামমোহন রায় ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারক,—মনি কাঞ্চন যোগ বলিতে হইবে। রামমোহন রায় ও লর্ড উইলিয়ম বেন্‌টিঙ্ক ঘটিত একটি সুন্দর গল্প আছে। রামমোহন রায়ের নিকট হইতে সহমরণ প্রথা নিবারণ কার্য্যে বিশেষ সাহায্য পাইতে পারেন ইহা লর্ড উইলিয়ম বেন্‌টিঙ্ক অবগত হইয়া রামমোহন রায় আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এই বাসনা জানাইয়া তাঁহার নিকট এডিকং প্রেরণ করেন। কিন্তু রামমোহন রায় বলিলেন "আমি এক্ষণে সাংসারিক কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া শাস্ত্র চর্চ্চা ও ধর্ম্মালোচনায় নিযুক্ত আছি। লাট সাহেবকে আমার বিনয় জানাইয়া বলিবেন যে রাজ-দরবারে যাইতে আমার বড় ইচ্ছা নাই অতএব তিনি যেন আমার অপরাধ মার্জ্জনা করেন।" রামমোহন রায়ের মত মহৎ লোক যে রাজসন্নিধানে যাইতে অনিচ্ছু হইবেন ইহা আশ্চর্য্য নহে। মহৎ লোকেরা রাজদর্শন ও রাজপ্রসাদের জন্য লালায়িত হয়েন না। কথিত আছে ফ্রান্স দেশীয় কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি নগর পরিত্যাগ করিয়া পল্লীগ্রামে বিজনে বাস করিতেন। রাজা লুই ফিলিপ তাঁহার ধার্ম্মিকতার বৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক তাহাতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার দর্শনার্থ তাঁহার পল্লীগ্রামস্থ বাটীতে আসিবার মানস জানাইয়া পাঠাইলেন। উক্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তি প্রত্যুত্তরে বলিয়া পাঠাইলেন যে "আমি রাজপ্রাসাদে যাইলে ভেব্‌রে যাইব; আর রাজা আমার ক্ষুদ্র নিকেতনে আইলে কষ্ট অনুভব করিবেন অতএব এ বিষয়ে সর্ব্বোত্তম বন্দোবস্ত এই যে যিনি যেখানে আছেন তিনি সেই খানেই থাকুন।" দিগ্বিজয়ী সেকন্দর একদা গ্রীক সন্ন্যাসী দায়োজিনিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। দায়োজিনিস তখন রৌদ্র পোহাইতে ছিলেন। রাজগর্ব্বে গর্ব্বিত সেকন্দর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি আমার নিকট কি প্রার্থনা কর?" দায়োজিনিস উত্তর করিলেন "আমি আর কিছুই প্রার্থনা করি না, তুমি আমার নিকট দাঁড়িয়া থাকাতে তোমার ছায়া পড়িয়া আমার রৌদ্র পোহাইবার ব্যাঘাত হইতেছে।

অতএব তুমি একটু সরিয়া দাঁড়াও।” রামমোহন রায় এডিকংকে যাহা বলিলেন এডিকং তাহা লাট সাহেবকে জানাইলেন। বেন্‌টিঙ্ক এডিকংকে জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি রামমোহন রায়কে কি বলিয়াছিলে?” এডিকং উত্তর করিলেন, “আমি বলিয়াছিলাম যে লর্ড উইলিয়ম বেন্‌টিঙ্ক গবর্ণর জেনেরলের সহিত আপনি একবার সাক্ষাৎ করিলে তিনি বিশেষ বাধিত হয়েন।” বেন্‌টিঙ্ক বলিলেন যে “তুমি পুনরায় যাও, গিয়া বল যে মিষ্টর্ উইলিয়ম বেন্‌টিঙ্কের সহিত আপনি একবার অনুগ্রহ পূর্ব্বক সাক্ষাৎ করিলে তিনি বিশেষ বাধিত হয়েন।” এডিকং পুনরায় রামমোহন রায়ের নিকট গিয়া তাহা বলিল। রামমোহন রায় বেন্‌টিঙ্কের এরূপ ভদ্রতা আর অতিক্রম করিতে পারিলেন না। তিনি বেন্‌টিঙ্কের নিকট আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন।

(২)

আমার পিতাঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি যে তিনি শিষ্যদিগকে বলিতেন আমাদিগের যে ধর্ম্ম তাহা Universal Religion অর্থাৎ বিশ্বজনীন অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম। এই কথা বলিতেন ও অমনি ভাবে গদ গদ হইতেন ও সেই সময়ে তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইত। আমার পিতাঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি বিলাতযাত্রার পূর্ব্বে রামমোহন রায় শিষ্যদিগকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে আমার মৃত্যুর পরে হিন্দুরা বলিবে আমি হিন্দু ছিলাম, মুসলমানেরা বলিবে আমি মুসলমান ছিলাম, খ্রীষ্টানেরা বলিবে আমি খ্রীষ্টান ছিলাম, কিন্তু বস্তুতঃ আমি কোন প্রচলিত ধর্ম্মাবলম্বী নহি। ইহাতে প্রকাশিত হইতেছে যে যে ধর্ম্ম মনুষ্যের আত্মাতে নিহিত, অন্তর্জগৎ ও বাহ্য জগৎ যে ধর্ম্মের সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, যাহা ভূলোকে ও দ্যুলোকে ঈশ্বরহস্ত দ্বারা অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, মনুষ্যের সহজ জ্ঞান যাহার একমাত্র অভ্রান্ত ধর্ম্ম গ্রন্থ, যাহা দেশকালের অতীত, সকল দেশের সকল কালের জ্ঞানী মনুষ্যেরা স্বীয় স্বীয় দেশ-প্রচলিত কল্পিত ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া যাহা অবলম্বন করেন, সেই বিশ্বজনীন অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম ছিল। কিন্তু তাহা প্রচার করিবার সময় যে জাতির মধ্যে তিনি তাহা প্রচার করিতে সচেষ্ট হইতেন সেই জাতির ধর্ম্মগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া তিনি তাহা প্রচার করিতেন। তিনি এই বিশ্বজনীন ধর্ম্ম হিন্দুদিগের মধ্যে বেদ বেদান্ত অবলম্বন করিয়া প্রচার করিতেন, কোরান অবলম্বন করিয়া মুসলমানদিগের মধ্যে প্রচার করিতেন ও বাইবেল অবলম্বন করিয়া খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে প্রচার করিতেন। তিনি এই সকল শাস্ত্র হইতে এক ঈশ্বরের মত উদ্ধার করিয়া তাহার উপদেশ দিতেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া এক ঈশ্বরের মত প্রতিপাদন করিতেন বলিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার বাক্যে অসঙ্গতি-দোষ ঘটিত।

রামমোহন রায়ের মনঃকল্পিত আদর্শ ব্রাহ্ম সমাজের জন্য পৃথিবী তখন প্রস্তুত ছিল না, এই জন্য ধর্ম্ম প্রচারের উল্লিখিত প্রণালী তিনি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এখনও তজ্জন্য পৃথিবী প্রস্তুত হয় নাই এবং বহুকাল ও হইবেক না। এখনও ভারতবর্ষের যে অবস্থা তাহা রামমোহন রায়ের প্রচার-প্রণালী আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি না। এখনও ভারতবর্ষের যে অবস্থা তাহাতে হিন্দু শাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক সম্পূর্ণ হিন্দু আকারে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করা কর্ত্তব্য। আমি চিরকাল হিন্দু শাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক সম্পূর্ণ হিন্দু আকারে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের কথা বলিয়া আসিতেছি। হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় যাউন, দেখিবেন দশ লক্ষ লোক সমাগত তখন বোধ হয় কোথায় বা ইংরাজী শিক্ষা! কোথায় বা ব্রাহ্মসমাজ! ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বজনীন ভাব রক্ষা করিয়া হিন্দু শাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক সম্পূর্ণ হিন্দু আকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার না করিলে ভারতবর্ষে উক্ত ধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে আমরা কখনই সুসিদ্ধি লাভ করিতে পারিব না।

(৩)

রামমোহন রায় এমনি অমায়িক-স্বভাব ছিলেন যে তিনি সামান্য দোষ জন্য শিষ্যদিগকে ভর্ৎসনা করিতে পারিতেন না। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে তিনি কাবা বাঁধা পাগড়ী পরিধান করিয়া ব্রাহ্ম সমাজে আসিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন। একবার দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় কুঠী হইতে কি-

রিয়া আসিয়া পুনরায় পোষাক না পরিয়া সামান্য ধুতি চাদর পরিয়া সমাজে আসিয়াছিলেন। রামমোহন রায় সমাজভঙ্গের পরে এই নিয়ম ভঙ্গ জন্য দ্বারকানাথ বাবুকে নিজে কিছু না বলিয়া তদ্বিষয়ে তাঁহাকে বলিতে অন্নদা-প্রসাদ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়কে অনুরোধ করেন। অন্নদাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় বলিলেন "মহাশয় কেন বলুন না?"। রামমোহন রায় সামান্য দোষ জন্য শিষ্যদিগকে ভৎর্সনা করিতে পারিতেন না; কিন্তু নিজে কোন দোষ করিলে এবং তজ্জন্য কোন শিষ্য তাঁহাকে ভৎর্সনা করিলে তাহা বিনীত ভাবে গ্রহণ করিতেন। সেকালের প্রথা অনুসারে রামমোহন রায়ের বাবরি ছিল। তিনি স্নানের পর তাঁহার দীর্ঘ কেশবিন্যাসে কিছু অধিক কাল ক্ষেপণ করিতেন। তাহা দেখিয়া তাঁহার স্পষ্টবক্তা শিষ্য তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছিলেন "মহাশয়! কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে, এই গীতটি কি কেবল পরের জন্যই হইয়াছে?" রামমোহন রায় অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন "হাঁ বেরাদর! * ঠিক বলিয়াছ; ঠিক বলিয়াছ।"

রামমোহন রায় সামান্য দোষ জন্য শিষ্যদিগকে ভৎর্সনা করিতে পারিতেন না কিন্তু কোন গুরুতর দোষ করিলে তাহা কখনও ক্ষমা করিতেন না। অপরিমিত মদ্য পান জন্য তিনি ছয় মাস তাঁহার কোন শিষ্যের মুখদর্শন করেন নাই। তাহাতেই শিষ্য সংশোধিত হইয়া যান।

তৎপরে এই গাতটী গীত হইল।

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালি।

ভজ অকাল নির্ভয়ে।
পবন তপন শশী ভ্রমে যাঁর ভয়ে।
সর্ব্ব কাল বিদ্যমান, সর্ব্ব ভুতে যে সমান, সেই সত্য তাঁরে নিত্য ভাবিবে হৃদয়ে।

পরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উত্থিত হইলেন। ইনি ব্রাহ্মসমাজের একটী বিকসিত পুষ্প, সৌন্দর্য্য ও সৌরভে ধর্ম্মোদ্যান আমোদিত করিতেছেন। ধর্ম্ম ইহাঁর হৃদয়ের ধন। ইনি বৈষয়িক উন্নতি তুচ্ছ করিয়া কেবল ধর্ম্ম লইয়া ভাবিয়াছেন। ইনি ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়াছেন, ধর্ম্মও ইহাঁকে রক্ষা করিতেছেন। ইনি ব্রাহ্মসমাজের একটী প্রদীপ্ত বহ্নি, ধর্ম্মজীবনে জ্বলন্ত প্রভা বিস্তার করিতেছেন। ইনি রামমোহন রায়ের সম্পর্কে ভূতপূর্ব্ব তত্ত্ববোধিনীসম্পাদক খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের রচিত একটি বক্তৃতা পাঠ করিতে অনুরুদ্ধ হন। এই উৎসাহশীল যুবক উত্থিত হইয়া কহিলেন, অক্ষয় বাবুর রচনা পাঠ করিতে আজ আমার হর্ষ ও দুঃখ যুগপৎ উত্থিত হইতেছে। হর্ষের কারণ এই যে যিনি প্রথমাবস্থায় নিজের জ্ঞান ও ধর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মসমাজকে পুষ্ট করিয়াছেন, যিনি ব্রাহ্মসমাজের পরিচর্য্যায় শরীর ও মন অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন সেই অক্ষয় বাবুর রচনা পাঠ করা আমি গৌরবের বিষয় জ্ঞান করি। দুঃখের বিষয় এই যে তিনি অসুস্থ শরীরে ব্রাহ্মসমাজের যেরূপ সেবা করিয়াছেন, আমরা এরূপ সুস্থ ও সবল হইয়াও তাহা পারিলাম না। পণ্ডিত শিবনাথ এই বলিয়া গত ২৩ পৌষ দিবসের সোমপ্রকাশে প্রকাশিত রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় অক্ষয় বাবুর বিরচিত অভিনব প্রবন্ধের বিশেষ বিশেষ স্থান পাঠ করিতে লাগিলেন। বয়োধিক্য ও পীড়া নিবন্ধন অক্ষয় বাবুর লেখনীর তেজস্বিতা কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই, তাহা এই প্রবন্ধ সম্যক প্রকাশ করিতেছে।

"যে সময়ে গুরুপাঠশালায় শুভঙ্করী অঙ্ক ও কৃচিৎ পার্সী কায়দা শিক্ষা অবধি সর্ব্বসাধারণ বিষয়ী লোকদিগের বিদ্যা-শিক্ষার চরম সীমা ছিল, সেই সময়ে যিনি পৃথিবীর প্রাচীন ও অপ্রাচীন বহুতর প্রধান ভাষা প্রভৃতি দশ ভাষায় ও বিবিধ বিজ্ঞানে স্বীয় অধিকার বিস্তার করেন; যিনি ভিন্ন ভিন্ন নানা ভাষায় স্বদেশের কল্যাণকর বিবিধ পুস্তক প্রস্তুত করেন, আপনার দেশভাষায় রীতিমত গদ্য

* রামমোহন রায় ভ্রাতৃভাবসূচক পারস্য শব্দ "বেরাদর" বলিয়া সকলকে সম্বোধন করিতেন।

গ্রন্থ রচনার পথ প্রদর্শন করেন, সেই ভাষার ব্যাকরণ রচনাদি দ্বারা তাহার শিক্ষা-প্রচলনের উপায়ানুষ্ঠান করেন এবং যেরূপ শিক্ষায় লোকের বুদ্ধি মার্জ্জিত ও কুসংস্কার বিনষ্ট হইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানপথে প্রবৃত্তি জন্মে, ইংরেজী বিদ্যালয় সংস্থাপনাদি দ্বারা স্বদেশে সেইরূপ শিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত করিবার জন্য যথোচিত চেষ্টা পান; যে সময়ে তাহারা ঘোরতর অজ্ঞান ও অশেষ প্রকার কুসংস্কারে অন্ধ হইয়াছিল, সেই সময়ে যিনি আপনার বুদ্ধি, বিদ্যা ও তেজস্বিতা প্রভাবে সমুদায় কুসংস্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশের আচার, ব্যবহার, ধর্ম্মাদি সংশোধন করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, ও সে বিষয়ে সুনিপুণ ও কৃতকার্য্য হইবার উদ্দেশে স্থলপথে ও সমুদ্রপথে কত কত অতি দূরস্থিত দুর্গম দেশ পরিভ্রমণ করিয়া নানা জাতির ধর্ম্ম, কর্ম্ম, রীতি, নীতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের সবিশেষ অনুসন্ধান করেন; যিনি স্বদেশীয় স্ত্রীলোকের ব্যথায় ব্যথিত ও কারুণ্য-রসে অভিষিক্ত হইয়া তদীয় শিক্ষা বিষয়ে সমুচিত যুক্তি প্রদর্শন ও নিতান্ত সানুকূলভাব প্রকাশ করেন, বহুবিবাহ রীতি ও বর্ত্তমান দায়াধিকার বিষয়ক ব্যবস্থা তাহাদের অশেষ ক্লেশের মূল ও অনেক অনর্থের কারণ বলিয়া প্রচার করেন, অসঙ্গত নিগ্রহ সহ্য করিয়াও প্রাণপণে সহমরণরূপ বিষময় প্রথা নিবারণ করেন এবং দেশময় এই জনপ্রবাদ প্রচলিত হয় যে, ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বিধবাবিবাহ প্রচলনের উদ্যোগ পাইবেন এইরূপ ইচ্ছা ব্যক্ত করেন; যে সময়ে স্বদেশীয় লোক সাধারণ হিতানুষ্ঠান ধর্ম্মের মর্ম্মগ্রহ করিতেই পারিত না, সেই সময়ে যিনি ঐ ধর্ম্মটি আপনার চিরজীবনের একমাত্র নিত্যব্রত স্বরূপ অবলম্বন করেন ও তাহাদের বিষম বিদ্বেষ ও ঘোরতর প্রতিকূলতা অতিক্রম করিয়া তাহাদেরই দুঃখ হরণ, সুখবর্দ্ধন ও সর্ব্বপ্রকার উন্নতিসাধন করিতে নিরন্তর প্রতিজ্ঞারূঢ় থাকেন, কেবল স্বজাতির শুভান্বেষণ নয়, যিনি ভূমণ্ডলের প্রধান প্রধান অন্যান্য ধর্ম্ম সংশোধন ও অন্য দেশীয় লোকের হিতানুষ্ঠান বিষয়েও উৎসাহ ও যত্ন প্রকাশ করেন; কেবল ধর্ম্মাদির পরিবর্ত্তন নয়, যিনি স্বয়ং স্বাধীন দেশের অধিবাসী ও রাজপুরুষের মধ্যে পরিগণিত না হইলেও, নিজের বুদ্ধি, বিদ্যা ও ক্ষমতা প্রভাবে রাজশাসনপ্রণালী সংশোধন ও উন্নতি সাধন করিয়া স্বদেশীয় লোকের দুঃখ হরণ ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনার্থ অতিশয় সাহসিকতা প্রদর্শন পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে চেষ্টা পান ও অসাধারণ বুদ্ধিগৌরব, রাজনীতিজ্ঞতা, অধ্যবসায় ও উপচিকীর্ষা প্রকাশ পূর্ব্বক ঐ সমস্ত অসামান্য বিষয়ে চিরজীবন অনুরক্ত থাকিয়া সে সময়েও আপনার জীবিতকাল মধ্যে যত দূর সম্ভব কৃতকার্য্য হন এবং যিনি উল্লিখিতরূপ মহৎ ক্রিয়ানুষ্ঠান, সর্ব্বহিতৈষিতা; সদাশয়তা, শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপগুণে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুসভ্য জাতীয় বিশিষ্ট লোকের প্রীতিপাত্র ও ভক্তিভাজন হইয়া যান, তাঁহার সদৃশ উক্তরূপ অসাধারণ বহুতর গুণালঙ্কারে অলঙ্কৃত ব্যক্তি ভূমণ্ডলে এবং বিশেষতঃ এরূপ অযোগ্য দেশে আর কখনও জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এ প্রকার দেখিতে পাওয়া যায় না। একাধারে এরূপ অশেষ প্রকার অসামান্যবিষয়িনী অলোকসামান্য বুদ্ধি, ক্ষমতা ও হিতৈষিতার একত্রসংযোগ আর কখন ঘটে নাই বোধ হয়।

অক্ষয় বাবু আর একস্থানে বলিয়াছেন।

ধন্য রামমোহন রায়! সেই সময়ে তোমার সতেজ বুদ্ধিজ্যোতিঃ ঘোরতর অজ্ঞানরূপ নিবিড় জলদ-রাশি বিদীর্ণ করিয়া এতদূর বিকীর্ণ হইয়াছিল এবং তৎসহকারে তোমার সুবিমল স্বচ্ছচিত্ত যে নিজ দেশে ও নিজ সময়ে প্রচলিত সকলপ্রকার কুসংস্কার নির্ব্বাচন করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিল, ইহা সামান্য আশ্চর্য্য ও সামান্য সাধুবাদের বিষয় নয়। তখন তোমার জ্ঞান ও ধর্ম্মোৎসাহে উৎসাহিত হৃদয় জঙ্গলময়-পঙ্কিল-ভূমি-পরিবেষ্টিত একটী অগ্নিময় আগ্নেয় গিরি ছিল; তাহা হইতে পুণ্য-পবিত্র প্রচুর জ্ঞানাগ্নি সতেজে উৎক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকিত। তুমি বিজ্ঞানের অনুকূলপক্ষে যে সুগভীর রণবাদ্য বাদন করিয়া গিয়াছ; তাহাতে যেন এখনও আমাদের কর্ণ-কুহর ধ্বনিত করিতেছি। সেই অত্যুন্নত গম্ভীর তুর্য্যধ্বনি অদ্যাপি বার বার প্রতিধ্বনিত হইয়া এই অযোগ্য দেশেও জয় সাধন করিয়া আসিতেছে। তুমি স্বদেশ ও বিদেশ-ব্যাপী ভ্রম ও কুসংস্কার সংহার উদ্দেশে আততায়ি-স্বরূপে রণদুর্ম্মদ বীর পুরুষের পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছ এবং বিচার-যুদ্ধে সকল বিপক্ষ পরাস্ত করিয়া নিঃসংশয়ে সম্যকরূপে জয়ী হইয়াছ। তোমার উপাধি রাজা। জড়ময় ভূমি-খণ্ড তোমার রাজ্য নয়। তুমি একটী সুবিস্তার মনোরাজ্য অধিকার করিয়া রাখিয়াছ। তোমার সমকালীন ও বিশেষতঃ উত্তরকালীন সুমার্জ্জিত-বুদ্ধি শিক্ষিত সম্প্রদায়ে তোমাকে রাজমুকুট প্রদান করিয়া তোমার জয়ধ্বনি করিয়া আসিতেছে। যাঁহারা আবহমানকাল হিন্দুজাতির মনোরাজ্যে নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগকে পরাজয় করিয়াছ। অতএব তুমি রাজার রাজা। তোমার জয়-পতাকা তাঁহাদেরই স্বাধিকার মধ্যে সেই যে উত্তোলিত হইয়াছে, আর পতিত হইল না, হইবেও না; নিয়ত একভাবেই উড্ডীয়মান

রহিয়াছে। পূর্ব্বে যে ভারতবর্ষীয়েরা তোমাকে পরম শত্রু বলিয়া জানিতেন, তদীয় সন্তানেরা অনেকেই এখন তোমাকে পরম বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন তাহার সন্দেহ নাই। কেবল ভারতবর্ষীয়দের বন্ধু কেন, তুমি জগতের বন্ধু।

তুমি এক দিকে জ্ঞান ও ধর্ম্মভূষণে ভূষিত করিয়া জন্ম-ভূমিকে উজ্জ্বল করিবার যত্ন করিয়াছ, অপর দিকে সঙ্কটময় সুগভীর সমুদ্র সমূহ উত্তরণ পূর্ব্বক ব্রিটিস রাজ্যের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া নানা-বিষয়ে রাজশাসন-প্রণালীর সংশোধন ও শুভ সাধনার্থ প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়াছ। সে সময়ের পক্ষে এ কি কাণ্ড! কি ব্যাপার! স্বাভাবিক শক্তির এতই মহিমা! তুমি ইংলণ্ডে গিয়া অধিষ্ঠান করিলে, তথাকার সুপণ্ডিত সাধু লোকে তোমার অসাধারণ গুণগ্রাম দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া যায়। তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, একবার তথাকার কোন সজ্জনসমাজে চমৎকারসম্বলিত এরূপ একটী অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হয়, যেন সাক্ষাৎ প্লেটো, সক্রেটিস বা নিউটন ধরণী-মণ্ডলে পুনরায় উপস্থিত হইলেন। তুমি আপন সময়ের অতীত বস্তু। কেবল সময়েরই কেন? আপন দেশেরও অতীত। ভারতবর্ষ তোমার যোগ্য নিবাস নয়। এক ব্যক্তি বলিয়া গিয়াছেন, এরূপ দেশে এরূপ লোকের জন্মগ্রহণ অবনীমণ্ডলে আর কখনও ঘটিয়াছিল বোধ হয় না।

সহমরণ নিবারণ, ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপন, স্বদেশীয় লোকের পদোন্নতি সাধন ইত্যাদি তোমার কত জয়-স্তম্ভ ও কীর্ত্তিস্তম্ভ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। না জানি কি কল্যাণময়ী মহীয়সী কীর্ত্তি সংস্থাপন উদ্দেশে অর্দ্ধভূমণ্ডল অতিক্রম করিতে কৃতসংকল্প ও প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলে। তাদৃশ সুদূরস্থিত ভূখণ্ডবাসী সুপ্রতিষ্ঠ সাধু লোকেও তোমার অসামান্য মহিমা জানিতে পারিয়া, প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক তোমাকে সমাদর করিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র ছিল। মনে মনে কতই শুভ সংকল্প সঞ্চারিত ও কতই দয়া-স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলে। কিন্তু এই ভারতের কপাল মন্দ। সে সমুদয় কর্ম্ম-ক্ষেত্রে আসিয়া আবির্ভূত হইল না।—বৃস্টল্!—বৃস্টল! তুমি কি সর্ব্বনাশই করিয়াছ! আমাদিগকে একেবারেই অনাথ ও অবসন্ন করিয়া রাখিয়াছ! যাহাতে অশেষরূপ অমৃত-স্বাদ ফল-রাশি উৎপৎস্যমান হইয়াছিল, সেই অ-লোক-সামান্য বৃক্ষমূলে সাজ্ঘাতিক কুঠার প্রহার করিয়াছ।

অক্ষয় বাবু এই বলিয়া প্রস্তাব উপসংহার করিয়াছেন।

তিনি জীবদ্দশায় স্বদেশীয় লোক কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া প্রত্যাশা করিয়াছিলেন উত্তরকালীন লোকে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইবে। কিন্তু একাল পর্য্যন্ত তাঁহার তাদৃশ কিছু দৃশ্যমান চিহ্ন প্রকাশ পায় নাই। ভাগ্যে সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় ইংলণ্ড ভূমিতে গমন করেন, তাই তাঁহার একটি রীতিমত সমাধি-মন্দির প্রস্তুত হয়। ভাল, ভারতবর্ষীয়গণ! তোমরা তো মধ্যে মধ্যে ব্যক্তি-বিশেষের স্মরণার্থে তদীয় প্রতিরূপাদি প্রস্তুত করিতে অগ্রসর হও, কিন্তু রামমোহন রায়ের একটি সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া বেণ্টিক মহোদয়ের দক্ষিণ হস্তের দিকে সংস্থাপন করিতে কি অভিলাষ হয় না? স্বদেশীয় গ্রন্থকারগণ! সবিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাঁহার একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবন-চরিত সঙ্কলন করিবা স্বীয় লেখনী সার্থক ও পবিত্র করা এবং তদ্দ্বারা তাঁহার ঋণের লক্ষাংশের একাংশ পরিশোধ করা কি অতি-মাত্র উচিত বোধ হয় না? আমরা কি অকৃতজ্ঞ! কি নরাধম!

সময়াভাবে শেষের দুইটী সঙ্গীত গীত হইল না। সেই দুইটী গীত এই—

রাগিনী সাহানা—তাল ধামাল।

ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়।
যাঁহাতে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয়।
জড়মাত্র ছিলে, জ্ঞান যে দিল তোমায়,
সকল ইন্দ্রিয় দিল তোমার সহায়;
কিন্তু তুমি ভুল তাঁরে এতো ভাল নয়।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল তেওট।

ভাব সেই একে।
জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।
যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যার, সে জানে সকল কেহ নাহি জানে তাঁকে।
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং, তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ, বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং।

পরে বাবু রাজনারায়ণ বসু উত্থিত হইয়া কহিলেন, আমি প্রস্তাব করি নগেন্দ্র বাবু অদ্যকার সভার কার্য্যবিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। এই প্রস্তাব সকলের গ্রাহ্য হইল।

ক্রমশ সায়ংসন্ধ্যা আসন্ন হইতে লাগিল। আমরা উৎসাহে পূর্ণ হইয়া রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজে চলিলাম। সূর্য্য অস্তে গিয়াছে, সমাজগৃহের দীপাবলী

প্রজ্বলিত হইল। আমরা ভক্তিভরে সমস্বরে ঈশ্বরবন্দনা করিয়া দিবসের পবিত্র কার্য্য শেষ করিলাম।

বন্দনা।

জয় দেব জয় দেব জয় মঙ্গলদাতা, জয় জয় মঙ্গলদাতা, সঙ্কট-ভয়-দুখত্রাতা, বিশ্বভুবনপাতা।
জয় দেব জয় দেব।

অচিন্ত্য অনন্ত অপার, নাহি তব উপমা, প্রভু নাহি তব উপমা; বিশ্বেশ্বর ব্যাপক বিভু চিন্ময় পরমাত্মা।

জয় দেব জয় দেব।

জয় জগবন্দ্য দয়াল, প্রণমি তব চরণে, প্রভু প্রণমি তব চরণে, পরমশরণ তুমি হে জীবন মরণে।
জয় দেব জয় দেব।

জগতারণ দীনেশ সুখশান্তিদাতা, প্রভু সুখশান্তিদাতা; শরণাগত-বৎসল তুমি পরম পিতা মাতা।

জয় দেব জয় দেব।

আপনা-প্রতি নিরখি না দেখি নিস্তার, প্রভু না দেখি নিস্তার; একমাত্র ভরসা হে করুণা তোমার।
জয় দেব জয় দেব।

শত অপরাধী আমরা পাপ ক্ষমা কর হে, প্রভু পাপ ক্ষমা কর হে, তব প্রসাদ লাভে প্রভু পাপ তাপ না রহে।

জয় দেব জয় দেব।

মিলিয়ে ভক্ত-সমাজ মাগি বরাভয় দান, প্রভু মাগি বরাভয় দান, কৃপা করি হে কৃপাময় দাও চরণে স্থান।

জয় দেব জয় দেব।

কি আর যাচিব আমরা করি হে এমিনতি, প্রভু করি হে এমিনতি, এলোকে সুমতি দাও পর লোকে সুগতি।

জয় দেব জয় দেব।

বিজ্ঞাপন।

বর্ষশেষের ব্রাহ্মসমাজ আগামী ৩০ চৈত্র শনিবার সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে হইবে,

এবং

নববর্ষের ব্রাহ্মসমাজ আগামী ১ বৈশাখ রবিবার প্রত্যূষে ৫ ঘটিকার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে হইবেক।

আয় ব্যয়

মাঘ ১৮০০ শক।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয় ৪৮১৸৶৫
পূর্ব্বকার স্থিত ... ১৫০।/৫
সমষ্টি ... ... ৬৩২। ১০
ব্যয় ... ... ৩৮০॥৶১৫
স্থিত ... ... ২৫১॥ ১৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ ১৮৬৸/১৫
দান প্রাপ্তি।
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১১১৶৫
,, চন্দ্রশেখর দেব ৫০
,, শিবচন্দ্র দেব ৫
শ্রীমতী ত্রৈলোক্যমোহিনী দাসী ৫
শ্রীযুক্ত গোকুলকৃষ্ণ সিংহ ২
,, বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ১
,, দিননাথ অধ্যেতা ১

১৭৫৶৫

দানাধারে প্রাপ্ত ৮॥০
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয় ৩৵১০

১৮৬৸/১৫

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ৭৪। ১০
পুস্তকালয় ... ৮০॥৶১৫
যন্ত্রালয় ... ৫০৸ ১৫
গচ্ছিত ... ৮৯। ১০

সমষ্টি ৪৮১৸৶৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ ১০৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ৯৬॥/ ৫
পুস্তকালয় ... ... ৩৩।৶১০
যন্ত্রালয় ৮৯৸/১০
গচ্ছিত ৫৭৸/১০

সমষ্টি ৩৮০॥৶১৫

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।